শিবচন্দ্র দেব
ও
বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী

অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ
২১১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে
দেবপ্রসাদ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত

মাঘোৎসব, ১৩৬৭

মূল্য পঁচাত্তর পয়সা

মুদ্রক পরেশ চন্দ্র বসু
ব্রাহ্ম মিশন প্রেস
২১১/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

শিবচন্দ্র দেব

ও

বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দী

পৃথিবীতে যুগে যুগে যে সকল স্মরণীয় ও বরণীয় পুরুষের আবির্ভাব ঘটিয়াছে, তাঁহাদিগকে আমরা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি,—যাঁহাদের কর্মক্ষেত্র বহু বিস্তৃত, এবং যাঁহাদের কর্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। সূর্য সারা বিশ্বে আলো দেয় কিন্তু মাটির প্রদীপের স্নিগ্ধ আলোক ক্ষুদ্র গৃহকোণে বিকীর্ণ হয়। বৈদিক ঋষিগণের বন্দিত সবিতা বা পূষা বাস্তবিকই জগৎ-প্রসবিতা; এই মহাদ্যুতি দিবাকর আমাদের সকল প্রাণশক্তি ও কর্মপ্রেরণার উৎস, নিশাকরের শুভ্র কৌমুদীও দিবাকরেরই প্রতিবিম্বিত আলোকচ্ছটা মাত্র। কিন্তু মাটির প্রদীপের সার্থকতা এইখানে যে, একটি দীপশিখা হইতে সহস্র দীপশিখা জ্বলিয়া উঠিতে পারে, 'প্রবর্তিতো দীপ ইব প্রদীপাৎ'।

নবযুগের প্রবর্তক মহামনীষী রামমোহন, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র প্রভৃতি লোকোত্তর পুরুষগণের

কর্মক্ষেত্র ছিল নিখিল বিশ্বে প্রসারিত, তাঁহারা স্বদেশ-প্রেমিক হইয়াও ছিলেন বিশ্ব-নাগরিক, ভাস্করের দীপ্তির ন্যায় তাঁহাদের দীপ্তিও ছিল দিগন্তবিসারী, স্বদেশের তথা বিশ্বের কল্যাণে ছিল তাঁহাদের সমগ্র জীবন উৎসৃষ্ট।

কিন্তু মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব কিংবা সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বরেণ্য পুরুষগণের মধ্যে স্বদেশ-প্রেমের ন্যূনতা না থাকিলেও তাঁহাদের কর্মক্ষেত্র ছিল সঙ্কীর্ণ, তাঁহারা অন্তরে মানব-প্রেমিক হইয়াও লোকচক্ষে ছিলেন স্বদেশপ্রেমিক, তাঁহারা স্নিগ্ধ প্রদীপশিখার ন্যায় তাঁহাদের চতুষ্পার্শ্বে কমনীয় আলোক বিকীরণ করিয়াছেন ; এই সকল অক্লান্তকর্মা পুরুষগণ ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেই মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। 'বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ'—ইঁহারা আমাদের নমস্য।

যাঁহারা বিশ্ববিশ্রুত, স্বদেশ-প্রেম, স্বজাতি-বাৎসল্য ও জাতীয়তার সীমাকে যাঁহারা অতিক্রম করিয়াছেন, তাঁহাদের অলৌকিক চরিত্র আমাদিগকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করে, কিন্তু যাঁহাদের কর্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ অথচ যাঁহাদের কর্মপ্রেরণার উৎস শুধু লোকের হিতসাধন, যাঁহারা প্রতিটি কর্মকে যজ্ঞে পরিণত করিতে পারেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত আমাদিগকে অধিকতর

সঞ্জীবিত করে। মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব এই দ্বিতীয় শ্রেণীর বরেণ্য পুরুষগণের মধ্যে বিশেষভাবে আমাদের স্মরণীয়।

শিবচন্দ্রের চরিতকার অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় লিখিয়াছেন—

'আমরা যে মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত সঙ্কলন করিতে উদ্যত হইয়াছি, তাঁহার সাধুচরিত লোক-বিশ্রুত নহে। দিগ্বিজয়ী বীর, অসাধারণ বাগ্মী, প্রতিভাশালী কবি, সূক্ষ্মদর্শী দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক, অলৌকিক ধীশক্তিসম্পন্ন ও বহুশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, লব্ধপ্রতিষ্ঠ কলাবিৎ, বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ, ধর্মের জন্য, দেশের জন্য বা লোকহিতের জন্য সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, তিনি এ সকলের মধ্যে কেহ ছিলেন না। তাঁহার বিশেষত্ব এই যে, তিনি বিশ্বনিয়ন্তার অখণ্ড বিধানে যে সমস্ত দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক বৃত্তি-নিচয়ের অধিকারী হইয়াছিলেন, ন্যস্ত ধনের ন্যায় তাহার এক কপর্দকও অপব্যয় করেন নাই এবং আজীবন সেই বৃত্তিগুলির সংরক্ষণে ও পরিস্ফুটনে যত্নশীল ছিলেন।'

সংসারে কোন মানুষই বংশানুক্রমিক সংস্কার ও পরিবেশের প্রভাবকে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করিতে পারে না, মহাত্মা শিবচন্দ্রও তাহা পারেন নাই। সুতরাং শিবচন্দ্রের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র-মাহাত্ম্য অনুধাবন

করিতে হইলে তাঁহার পূর্বপুরুষ, এবং বিশেষভাবে তাঁহার পিতা-মাতা সম্পর্কে ও তৎকালীন বাংলার সমাজ-বিপ্লব ও ধর্মান্দোলন সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন। শিবচন্দ্রের উপর তাঁহার পিতা-মাতার প্রভাব সম্পর্কে তাঁহার চরিতকার লিখিয়াছেন—

'মহাত্মা শিবচন্দ্র পিতৃদেবের আত্মনির্ভরশীলতা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞতা, উদ্যমশীলতা, কর্মিষ্ঠতা, শারীরিক নিয়ম পালন, যত্নশীলতা প্রভৃতি সমস্ত সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তিনি পিতার নিকট ঘড়ি ধরিয়া কাজ করিতে এবং প্রত্যেক কার্য নিপুণতা ও শৃঙ্খলার সহিত সম্পন্ন করিতে শিখিয়াছিলেন। তাঁহার চিরশান্ত প্রকৃতি তাঁহার মাতৃদত্ত ধন।' বাস্তবিক, গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী শিবচন্দ্র বুঝিয়াছিলেন, গণিত সম্পর্কে জ্ঞান না থাকিলে অর্থাৎ জীবনে নিয়ম ও শৃঙ্খলা না থাকিলে জীবন ভয়াবহ রূপ ধারণ করিত।

'What would life be without Arithmetic

But a scene of horrors ?

শিবচন্দ্র ছিলেন মিতাহারী, মিতাচারী, মিতভাষী অথচ প্রিয়বাদী, কিন্তু অপরের মনোরঞ্জনের জন্য তিনি কখনও সত্যের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হন নাই ;—'সত্যান্ন প্রমদিতব্যম্', ধর্মান্ন প্রমদিতব্যম্', 'কুশলান্ন প্রমদিতব্যম্', —সত্যের আদর্শ হইতে, ধর্মের আদর্শ হইতে, কুশলের

আদর্শ হইতে কখনও প্রমত্ত হইবে না,—ভারতীয় আচার্যগণের কণ্ঠনিঃসৃত এই বাণী সর্বদা তাঁহার স্মৃতিতে জাগরূক ছিল।

মানুষের সমাজ যে নিয়ত পরিবর্তনশীল এ বিষয়ে সমাজ-বিজ্ঞানীদের মধ্যে ঐক্যমত দৃষ্ট হয়। ইংরেজ কবি টেনিসন বলেন, প্রাচীন বিধান পরিবর্তিত হয়, নূতন বিধান তাহার স্থান অধিকার করে। এইভাবে ঈশ্বরের অভিপ্রায় বিচিত্র সার্থকতা লাভ করে, কারণ, যে রীতি এককালে হিতকর, সেই রীতিকে চিরন্তন করিয়া রাখিতে চাহিলে জগৎ গ্লানিযুক্ত হয়।

'The old order changeth, yielding
place to new,
And God fulfills Himself in many ways,
Lest one good custom should corrupt
the world'.

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ, গ্রীক দার্শনিক হেরাক্লিটাস ও একালের ফরাসী দার্শনিক বের্গসঁ বলিয়াছেন,—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ পরিবর্তনের ধারা ভিন্ন আর কিছুই নহে, সংসারে নিত্য, শাশ্বত বা অবিনশ্বর বলিয়া কিছুই নাই। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ দার্শনিকই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নিত্য বস্তুকেও স্বীকার করিয়াছেন। ধর্মের ক্ষেত্রেও ভারত নিত্য বা শাশ্বত ধর্মের সঙ্গে যুগধর্ম ও

আপদ্ধর্মকে স্বীকৃতি দান করিয়াছেন। ভগবান মনু ও বিশালবুদ্ধি ব্যাসদেব যেমন প্রতি বর্ণের জন্য বিহিত ধর্মের কথা বলিয়াছেন, তেমনই সর্ব বর্ণের পালনীয় ধর্মেরও নির্দেশ দিয়াছেন।

সমাজে যে পরিবর্তনের স্রোত সর্বদা প্রবাহিত হইতেছে উহা অভিব্যক্তি বা ইভোলিউশনের ফল, কিন্তু সমাজমাত্রেই যে ধীরে ধীরে ক্রমোন্নতি বা অগ্রগতির পথে যাত্রা করিয়াছে, এ কথা অনেক দার্শনিকই স্বীকার করেন না। বাস্তবিক, অগ্রগতি বলিতে যদি বোঝায় মহৎ লক্ষ্যের দিকে পদক্ষেপ, তাহা হইলে বলিতে হইবে সামাজিক অগ্রগতি ও সমাজের বিবর্তন বা অভিব্যক্তি এক জিনিস নয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা বলিতে পারি, ষোড়শ শতকের বাংলায় যে মহাভাবের প্লাবন প্রবাহিত হইয়াছিল এবং যে প্লাবনে ভারতের নানা অঞ্চল সিক্ত ও আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলায় সে প্লাবনের ধারা ক্ষীণ ও মন্দীভূত হইয়াছিল। অবশ্য, অষ্টাদশ শতকেই বাংলা দেশে ভারতচন্দ্রের ন্যায় শব্দচয়ন-কুশলী রসস্রষ্টার ও মাতৃচরণে সমর্পিত প্রাণ শ্রীরামপ্রসাদের ন্যায় সত্যদ্রষ্টার আবির্ভাব ঘটিয়াছিল; তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—'অবনত অবস্থায়ও বঙ্গভূমি রত্ন-প্রসবিনী'। বাস্তবিক, এই শতকে সাধারণ বাঙ্গালী-চরিত্রে বলিষ্ঠ

পৌরুষের অভাব ঘটিয়াছিল এবং প্রায় সমগ্র জাতিই কল্যাণের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল।

উনিশ শতকের প্রথম পাদেও বাঙ্গালীর জীবনে নানাবিধ অনাচার ও ব্যভিচার প্রবেশ করিয়াছিল, কেননা তাহাদের সম্মুখে কোন মহান্ লক্ষ্য ছিল না। ইংরেজের প্রসাদে যাহারা হঠাৎ বিত্তশালী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা অনেকেই বিলাসিতার পঙ্কিল স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছিল, ধর্ম তাহাদের নিকট প্রাণহীন আচার-অনুষ্ঠানমাত্রে পরিণত হইয়াছিল। শ্রদ্ধেয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে দেখাইয়াছেন, উনিশ শতকের প্রথম পাদে কলিকাতা নগরীতে স্বাস্থ্যের অবস্থা যেমন শোচনীয় ছিল, তেমনই বাঙ্গালী সমাজের দেহে নানা ব্যাধি প্রবেশ করিয়া উহাকে ব্যাধিগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে সর্বতোমুখী নবজাগৃতি ঘটিয়াছিল এবং যাহার ফলে অভিনব সাহিত্য-সৃষ্টি, সমাজ-সংস্কার, রাজনৈতিক আন্দোলন ও ধর্ম-আন্দোলনের মধ্য দিয়া বাঙ্গালী মনীষা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, সেই জাগরণের মূলে ছিল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের সংঘাত এবং পাশ্চাত্ত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে বাংলার কতিপয় বরেণ্য পুরুষের ভারত-আবিষ্কারের প্রয়াস। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের পরে বাঙ্গালীর

জাতীয় জীবনে যে অবসাদ ও নৈরাশ্য পুঞ্জীভূত হইয়াছিল, উহার অপনোদনের জন্যই বাহিরের প্রচণ্ড আঘাতের প্রয়োজন হইয়াছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালীর ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিলেও এবং ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের রাজত্বকালে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত, অনাহার-ক্লিষ্ট, রোগজীর্ণ, আশাশূন্য প্রজাগণের নিকট হইতে নির্মম ভাবে রাজস্ব আদায় করা হইলেও ভারতের তথা বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ব্রিটিশ শাসন অনেকাংশে কল্যাণ-প্রসূ হইয়াছে।

এই ইংরেজ-শাসনের আদিপর্বেই রাজা রামমোহন রায় (জন্ম ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ), রাধাকান্ত দেব (জন্ম ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দ), দ্বারকানাথ ঠাকুর (জন্ম ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দ) প্রভৃতি বরেণ্য পুরুষগণের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। মনস্বী কার্লাইল যাঁহাদিগকে 'হিরো' আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদিগকে 'অমেয়াত্মা পুরুষ' বলিতে পারি।

মহাত্মা কার্লাইলের অনুসরণ করিয়া আমরা বাংলার নবযুগের অমেয়াত্মা পুরুষগণকে নিম্নোক্ত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি—

(ক) ধর্ম সংস্কারক বা সমাজ সংস্কারকরূপে অমেয়াত্মা পুরুষগণ (The hero as reformer)—যথা রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি। আমাদের দেশে

সমাজসংস্কারও যে ধর্ম-সংস্কারের অন্তর্গত ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না।

(খ) শিক্ষাব্রতী-রূপে (The hero as teacher)—যথা হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও।

(গ) কবি-রূপে বা ক্রান্তদর্শী রসস্রষ্টা-রূপে (The hero as poet)—যথা মধুসূদন।

(ঘ) কর্মবীর-রূপে (The hero as a man of action)—যথা শিবচন্দ্র দেব, শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

(ঙ) মননশীল মুনি-রূপে (The hero as a man of contemplation)—যথা অক্ষয়কুমার, ভূদেব।

(চ) প্রজ্ঞাবান চিন্তানায়ক-রূপে (The hero as a man of letters)—যথা বঙ্কিমচন্দ্র। প্রজ্ঞাবান বলিয়াই ইঁহার ধ্যাননেত্রে 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্র প্রতিভাত হইয়াছিল।

(ছ) ধর্মসংস্থাপক-রূপে (The hero as prophet)—যথা শ্রীরামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি।

(জ) ভীমকর্মা প্রচারক-রূপে (The hero as preacher)—যথা কেশবচন্দ্র, কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন ইত্যাদি।

আমাদের এই শ্রেণীবিভাগ যে ন্যায়শাস্ত্রসম্মত নয়, তাহা আমরা জানি, বাংলার অনেক বরেণ্য পুরুষের নাম যে এই তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে, সে বিষয়েও আমরা সচেতন, কিন্তু তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার

সামগ্রিক রূপকে উপলব্ধি করিতে হইলে এরূপ একটি তালিকার প্রয়োজন আছে।

আমরা বলিয়াছি, কোন্নগরের শিবচন্দ্র দেব ছিলেন একজন কর্মবীর এবং তাঁহার সকল কর্মপ্রেরণার উৎস ছিল স্বদেশের হিতসাধন। পূতসলিলা গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ কোন্নগরের পণ্ডিতসমাজের খ্যাতি দিগ্‌দিগন্তে প্রসারিত হইয়াছিল। আমরা ষোড়শ শতকের মঙ্গলকাব্য কবিকঙ্কণ চণ্ডীতেও এই বর্ধিষ্ণু গ্রামেব উল্লেখ পাই। বঙ্কিমচন্দ্র-কর্তৃক 'বঙ্গদর্শন' প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাঙ্গালী পাঠকমাত্রেই সূর্যমুখীর পিত্রালয়ের নামের সঙ্গে পরিচিত। ঋষি অরবিন্দের, হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্রের ও রাজা দিগম্বর মিত্রের পুণ্যস্মৃতি-বিজড়িত কোন্নগর বহু বরেণ্য বাঙ্গালীব জন্মভূমি। এই সকল বাঙ্গালী সন্তানদের মধ্যে 'পদ্যপাঠ' রচয়িতা যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায় এককালে বিশেষ্ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের শাস্ত্র বলেন, যে স্থানে কোন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়, সে স্থান তীর্থীভূত হয়, অর্থাৎ তীর্থের মর্যাদা লাভ করে। বাংলার কেন্দুবিল্ব, নান্নুর, ফুলিয়া, সিঙ্গি, ঝামটপুর, নবদ্বীপ, শান্তিপুর, হালিসহর দক্ষিণেশ্বর প্রভৃতি স্থান যদি তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে রাধানগর বা কোন্নগরই বা কেন তীর্থের গৌরব লাভ করিবে না?

দার্শনিক এমার্সন তাঁহার Representative Men প্রবন্ধমালার প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছেন—

'He is great who is what he is from nature and who never reminds us of others'.

যুগ-মানবমাত্রেই স্বধর্মের অনুসারী, অপরের অনুকারী নন বলিয়াই তাঁহারা অনন্যসাধারণ। তাই তাঁহারা যখন মহাপ্রয়াণ করেন, তখন আমরা অনুভব করি—

'জায়ন্তে চ ম্রিয়ন্তে চ মদ্বিধা ক্ষুদ্র জন্তবঃ।
অনেন সদৃশো লোকে ন ভূতো ন ভবিষ্যতি'॥

শিবচন্দ্র অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন অমেয়াত্মা পুরুষ, তিনি ছিলেন যুগমানব।

উনিশ শতকের বাংলায় যে নব জাগরণ ঘটিয়াছিল, তাহার মূলে ছিল—

(ক) বহিরাগত ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রচণ্ড আঘাত। উনিশ শতকের প্রথম পাদেই উইলিয়াম কেরী প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণ কর্তৃক বাইবেল ও যীশুর বাণী প্রচার। এই সময়েই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা ও বাংলা গদ্যের সূত্রপাত।)

(খ) বাংলা দেশে বহু বরেণ্য মনস্বীর আবির্ভাব। বাংলায় প্রাচীনপন্থী ও নবীনপন্থীদের মধ্যে ভাব-সংঘর্ষ।

(গ) বাংলার বিপ্লবী তরুণ দলের হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিরূপতা,—পরিণত বয়সে ইঁহাদের অনেকের মনেই শুভবুদ্ধির উদয় হইয়াছিল ও ইঁহারা ঐতিহ্যের মূল্যবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

(ঘ) রাজা রামমোহনের সমন্বয়ী প্রতিভা,—প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সংস্কৃতির মধ্যে সেতু রচনার প্রয়াস।

(ঙ) মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্রাহ্মধর্ম-প্রবর্তন,—উপনিষদ ও বেদান্তের আদর্শ-প্রচার।

(চ) কেশবচন্দ্রের ধর্মসাধনার নানা ধারা,—নববিধানের প্রবর্তন,—উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ, মৌলানা গিরিশচন্দ্র সেন প্রভৃতি প্রচারকগণের উপর বিভিন্ন ধর্মপ্রচারের ভার অর্পণ।

(ছ) পাশ্চাত্ত্য যুক্তিবাদের আলোকে হিন্দুধর্মের ও এই ধর্মের প্রাণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ চরিত্রের মূল্য নির্ণয়ের প্রয়াস—হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থান—বঙ্কিমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র।

(জ) দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যভাবের সাধনা ও সিদ্ধি,—ধর্ম সম্পর্কে নূতন আলোকপাত—ধর্ম সমন্বয়ের আদর্শ—রামকৃষ্ণ ও নরেন্দ্রনাথের মিলন এবং পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী তরুণ যুবকের নবজন্ম লাভ।

শিবচন্দ্র দেবের বিশেষ সৌভাগ্য, তাঁহার শৈশবেই বাংলা দেশে সমাজ-বিপ্লব ও ধর্ম-বিপ্লবের সূচনা হইয়াছিল; তিনি ডিরোজিওর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন

এবং বহুবরেণ্য পুরুষের সাহচর্য লাভ করিয়াছিলেন; সর্বোপরি, তিনি মনোবৃত্তির অনুসারিণী মনোরমা ভার্যা লাভ করিয়াছিলেন।

শিবচন্দ্রের চরিত-কথা আলোচনা করিতে হইলে সর্বপ্রথম এমন কয়েকজন বরেণ্য পুরুষের কথা বলিতে হয়, যাঁহারা তাঁহার উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সুতরাং আমরা সেই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

রামমোহন ও শাশ্বত ভারত

বাংলা দেশে নবযুগের প্রবর্তক ও যুগ-প্রতিনিধি, অসাধারণ মনস্বী, বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত, মানব-ধর্মে দীক্ষিত, লোকশ্রেয়র আদর্শে উদ্বুদ্ধ, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য আদর্শের মধ্যে মিলনে বিশ্বাসী, নারী-জাতির সর্ববিধ অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী (সহমরণ-বিষয়: প্রবর্তক ও নিবর্তক সংবাদ দ্রষ্টব্য), বাংলা সাহিত্যে বিতর্কমূলক দার্শনিক প্রবন্ধের পথিকৃৎ সব্যসাচী রাজা রামমোহনের মধ্যে হিন্দু, মুস্লিম ও খ্রীষ্টীয় সংস্কৃতির ত্রিধারা মিলিত হইয়াছিল। তিনি যে শাশ্বত ভারত আবিষ্কার করিয়াছিলেন, সে ভারতের অন্তরাত্মার বাণী নিবদ্ধ রহিয়াছে উপনিষদ ও বেদান্তে কিন্তু পুরাণ-তন্ত্রাদির যে যে বচনের সঙ্গে শ্রুতির বিরোধ নাই, সেই সেই বচন

তিনি প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। আচার্য শঙ্করের তীক্ষ্ণ নৈয়ায়িক প্রতিভা, সূফী সাধকদের প্রেমধর্ম, মোতাজেলাদের যুক্তিবাদ ও খ্রীষ্টের প্রবর্তিত চরিত্র-নীতি তাঁহাকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল কিন্তু খ্রীষ্টের জীবনের অলৌকিক কাহিনী তিনি বর্জন করিয়াছিলেন। দেশীয় পণ্ডিতগণ ও বিদেশীয় প্রচারকগণের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া তিনি সর্বত্র জয়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু এ কথাও সত্য যে, তাঁহার ধ্যানে ভারতীয় সাধনার সামগ্রিক রূপটি প্রতিফলিত হয় নাই। বৈষ্ণবগণের প্রেম-সাধনার মর্ম-মূলে তিনি প্রবেশ করিতে পারেন নাই; "গোস্বামীর সহিত বিচারে' বৈষ্ণবধর্মের প্রতি তাঁহার বিরূপতা সুস্পষ্ট। 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার', 'কবিতাকারের সহিত বিচার', 'সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার' প্রভৃতি গ্রন্থে আমরা নৈয়ায়িক রামমোহনের সাক্ষাৎ পাই। রামমোহনের সমগ্র বাংলা রচনায়, এমন কি, তাঁহার ব্রহ্মসংগীতেও আমরা যে মানুষটির সাক্ষাৎ পাই, তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু ও জ্ঞানী, উহাতে তাঁহার ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তের পরিচয় প্রায় মিলে না। রামমোহন বিশ্বাস করিতেন, তাঁহার প্রবর্তিত ধর্মান্দোলনের দ্বারা ভারতবাসিগণ রাজনীতি-ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা ও সমাজ-জীবনে স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করিবে। ব্রাহ্মসমাজ বা সর্বজনীন উপাসনামন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন ব্রহ্মনিষ্ঠ

গৃহস্থজীবনের আদর্শ আবিষ্কার করিয়াছেন মহানির্বাণ-তন্ত্রের একটি বচন হইতে—

ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ।
যদ্ যদ্ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্ ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ' ॥

হেনরী ভিভিয়ান ডিরোজিও
ডেভিড্ হেয়ার

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যখন প্রাচীন ও নবীন ভাবধারার মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, তখন যাঁহারা প্রাচীন আদর্শকেই একমাত্র কল্যাণের পন্থা বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে শব্দকল্পদ্রুমের রচয়িতা রাধাকান্ত দেব (ইনি অবশ্য স্ত্রীশিক্ষা বিধায়কেরও রচয়িতা এবং নারীদিগের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন), 'নববাবুবিলাস', 'নববিবিবিলাস' প্রভৃতি বিদ্রূপাত্মক গ্রন্থের প্রণেতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ছিলেন অগ্রণী ব্যক্তি। যাঁহারা প্রাচীনকে সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিয়া নবীন আদর্শকেই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন, যাঁহারা অজ্ঞতা ও যৌবন-সুলভ অবিমৃষ্যকারিতার ফলে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করিয়াছিলেন এবং পাশ্চাত্য নরনারীর অনাচারকেও পৌরুষের লক্ষণ বলিয়া

গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রায় সকলেই ছিলেন হিন্দু কলেজের বিদ্রোহী শিক্ষক, তরুণ কবি, ছাত্র-সংসদের লব্ধকীর্তি হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও'র শিষ্য বা অনুরাগীবৃন্দ। এদিকে, রামমোহন ও তাঁহার আত্মীয় সভার সভ্যবৃন্দ ভারতের সনাতন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়াও এদেশে প্রতীচ্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন এবং প্রতীচ্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

অবশ্য, ডিরোজিও'র সাক্ষাৎ শিষ্য বা অনুরাগীদিগের মধ্যে যাঁহারা উত্তরকালে যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই পরিণত বয়সে আত্মস্থ হইয়াছিলেন এবং দেশের হিতকর বিবিধ কর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। দেশের কল্যাণে আত্মোৎসর্গকারী শিবচন্দ্র দেব ইঁহাদেরই অন্যতম। ডিরোজিও'র শিষ্যগণের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, রামতনু লাহিড়ী, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র (টেকচাঁদ ঠাকুর), রাধানাথ সিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি জীবনের নানা ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণমোহন, প্যারীচাঁদ ও রাধানাথের দানে বাংলা সাহিত্যও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে।

সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত তরুণ কবি

ডিরোজিও ছিলেন এক অদ্ভুতকর্মী পুরুষ। এই পোর্তুগীজ বংশোৎপন্ন ফিরিঙ্গী যুবক স্বরচিত একটি কবিতায় ভারত-ভূমিকে মাতৃভূমি বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন ডিরোজিওর জীবনের ব্রত ছিল,—তরুণ ছাত্রদের মনে স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ সাধন। ছাত্রসমাজের উপর ডিরোজিও যে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন, সে কথা স্মরণ করিয়া আজও আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হই। ডিরোজিওর চরিতকার তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে প্রত্যক্ষদর্শীর যে উদ্ধৃতি দিয়াছেন, তাহা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

'Mr. Derozio's disinterested zeal and devotion in bringing up the students in these subjects (poetry and literature and moral philosophy) was unbounded, and characterised by a love and philanthropy which, up to this day, has not been equalled by any teacher either in or out of the service. The students in their turn loved him most tenderly ; and were ever ready to be guided by his counsels and imitate him in all their daily actions in life'. (রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ দ্রষ্টব্য।)

ডিরোজিও ছিলেন চির দুরন্ত দুর্দম যৌবন-শক্তিরই

প্রতীক, যে যৌবনের জয়গান করিয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

'শিকলদেবীর ওই যে পূজা বেদী
চিরদিন কি রইবে খাড়া ?
পাগলামি তুই আয়রে দুয়ার ভেদি,
ঝড়ের মাতন বিজয়-কেতন নেড়ে,
অট্ট হাস্যে আকাশখানা ফেঁড়ে,
ভোলানাথের ঝোলাঝুলি ঝেড়ে
ভুলগুলো তুই আনরে বাছা বাছা,
আয় প্রমত্ত, আয়রে আমার কাঁচা।

সেকালের 'ইয়ং বেঙ্গল' অবশ্য ডিরোজিও'র শিক্ষার তাৎপর্য সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে না পারিয়া নানা বিষয়েই উগ্রতা ও আতিশয্যের পরিচয় দিয়াছিল। কিন্তু ডিরোজিও'র শিষ্যগণ যে কখনও মিথ্যা ভাষণ ও কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই, এ কথা তাহাদের বিরুদ্ধবাদিগণও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বাস্তবিক, সর্বপ্রকার আতিশয্যসত্ত্বেও ডিরোজিও ছিলেন বাংলার নবযুগের অন্যতম স্রষ্টা।

পরকে আপন করিবার, বিদেশকে স্বদেশে পরিণত করিবার প্রতিভা ছিল মহামতি ডেভিড্ হেয়ারের। রাজা রামমোহনের প্রায় সমবয়স্ক এই মহানুভব পুরুষ (জন্ম ১৭৭৫) স্কটল্যাণ্ড হইতে ঘড়িনির্মাতারূপে বাংলা

দেশে আগমন করিয়া পরবর্তীকালে নিঃস্বার্থভাবে শিক্ষা বিস্তারের মধ্য দিয়া মানুষ গড়ার কার্যে আত্ম-নিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি রাজা রামমোহনকে বন্ধুরূপে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। এ দেশের দরিদ্র, নিঃস্ব বালকগণের নিকট তিনি ছিলেন একাধারে কল্যাণকামী পিতা, স্নেহময়ী মাতা, হিতৈষী সখা। প্রচলিত খ্রীষ্টধর্মে তাঁহার আস্থা ছিল না, এইজন্য খ্রীষ্টীয় ধর্মাচার্যগণ তাঁহাকে সমাহিত করেন নাই, কিন্তু তিনি ছিলেন মানবতা-ধর্মে দীক্ষিত। তাই কবি সত্যেন্দ্রনাথ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন—

'মনুষত্ব-ধর্মে পূত ! হে নাস্তিক ! আস্তিকের গুরু !'

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও রাজনারায়ণ

রাজা রামমোহনের যিনি প্রত্যক্ষদর্শী, পণ্ডিত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের যিনি অনুরাগী শিষ্য, ব্রাহ্মধর্মের যিনি প্রবর্তক এবং উপনিষদের ঋষিগণ ও হাফিজ প্রভৃতি সূফী সাধকগণের ভাবধারার যিনি উত্তরাধিকারী, সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন নব্য বাংলার অন্যতম স্রষ্টা। খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণের অপপ্রচারের ফলে বিভ্রান্ত আত্মবিস্মৃত মোহগ্রস্ত বাংলার তরুণগণকে আত্মসম্বুদ্ধ করিবার জন্যই তিনি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মের প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। সমাজ-সংস্কারের ব্যাপারে রক্ষণশীল

দেবেন্দ্রনাথের মনে তেমন কোন উন্মাদনা ছিল না, কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণ কর্তৃক কৌশলে ধর্মপ্রচারের প্রয়াস তাঁহাকে অতি মাত্রায় ক্ষুব্ধ করিয়াছিল; তাই তিনি ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' ও ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জ্ঞানতপস্বী বহুশ্রুত অক্লান্ত সাহিত্যসেবী অক্ষয়কুমার দত্তকে এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন। পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে যে অক্ষয়কুমারের মতবিরোধ ঘটে, মহর্ষির আত্মচরিতে তাহার উল্লেখ আছে। মহর্ষি চাহিয়াছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'কে প্রধানত বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্ম প্রচারের বাহন করিতে, আর অক্ষয়কুমার চাহিয়াছিলেন পত্রিকাখানিকে প্রধানত জ্ঞান বিজ্ঞান প্রচারের বাহন করিতে; তথাপি দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়-কুমারের স্বাধীনতায় বিশেষ হস্তক্ষেপ করেন নাই। দেবেন্দ্রনাথ একদিন বিশ্বাস করিতেন, শ্রুতিপ্রতিপাদ্য ধর্ম অভ্রান্ত; কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি এই মত প্রচার করিয়াছেন যে, কোন ধর্মশাস্ত্রই সম্পূর্ণ অভ্রান্ত নহে, আত্ম-প্রত্যয়সিদ্ধ জ্ঞানোজ্জ্বলিত বিশুদ্ধ হৃদয়ই ধর্মের উৎস। অনেকে মনে করেন যে, তাঁহার এই মত পরিবর্তনের মূলে অক্ষয়কুমারের ও রাজনারায়ণ বসুর প্রভাব আছে।

রাজা রামমোহন তাঁহার বেদান্ত-ব্যাখ্যানে (বেদান্ত

গ্রন্থ) মায়াবাদের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। শঙ্করাচার্যের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধাবান হইয়াও তিনি তাঁহার ব্যাখ্যাত 'মায়াবাদ'কে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, কিন্তু তিনি অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করেন নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ কিন্তু পরিমিত দেবতার উপাসনার সঙ্গে অদ্বৈতবাদেরও বিরোধিতা করিয়াছেন। মহানির্বাণতন্ত্রের যে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মস্তোত্র 'পঞ্চরত্ন' নামে খ্যাত, উহা রাজা রামমোহন অবিকৃতভাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু মহর্ষি নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাকে স্বীকার করিতে পারেন নাই ; তিনি নিরাকার সগুণ ব্রহ্মেরই (Personal God) উপাসনার প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং মহানির্বাণতন্ত্রোক্ত ব্রহ্মস্তবের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করিয়াছিলেন।

মনস্বী অক্ষয়কুমারও ব্রাহ্মসমাজভুক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি ছিলেন প্রখর যুক্তিবাদী। দেবেন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম জীবনের মূল সূত্র ভক্তিসূত্র হইতে গৃহীত,—'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্যপ্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব', কিন্তু অক্ষয়-কুমারের মতে ধর্মের প্রধান লক্ষণ 'তস্যপ্রিয়কার্য্যসাধনং'। যিনি প্রকৃতির নিয়মকে বা বিধাতার বিধানকে লঙ্ঘন করেন না, যিনি শান্ত, সংযত ও জ্ঞানাহরণে সর্বদা তৎপর, অক্ষয়কুমারের মতে তিনিই ধার্মিক। অক্ষয়কুমারের ধর্মনীতিতে ভক্তি, উপাসনা বা প্রার্থনার স্থান গৌণ,—এ ধর্ম জ্ঞান ও কর্মের উপরেই প্রতিষ্ঠিত।

পরিণত বয়সে তিনি নাকি সমীকরণ বা ইকুয়েশনের সাহায্যে প্রার্থনার মূল্যকেই অস্বীকার করিয়াছেন।

যাঁহারা বিজ্ঞানকে সাহিত্যগুণে মণ্ডিত করিয়া তুলিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অক্ষয়কুমারের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। 'ধর্মনীতি', 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ-বিচার' ও 'ভারতবর্ষীয় উপাসক-সম্প্রদায়' প্রভৃতি গ্রন্থ যুক্তিবাদী জ্ঞানতাপস অক্ষয়কুমারের মনস্বিতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

যুগসন্ধির কবি, আধুনিক ব্যঙ্গ কবিতার প্রবর্তক, খাঁটি বাঙ্গালী অথচ ঐতিহাসিক চেতনাসম্পন্ন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত নানা বিষয়ে বহু খণ্ড-কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত পারমার্থিক ও নৈতিক কবিতাও সংখ্যায় অল্প নহে। তাঁহার পারমার্থিক কবিতায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব সুস্পষ্ট। তাঁহার রচিত কবিতার একটির নাম 'নির্গুণ ঈশ্বর'। এই নামকরণ বিভ্রান্তিকর, কেননা কবিতাটির মধ্যে তিনি ঈশ্বরকে পিতৃরূপে ভাবনা করিয়া তাঁহার নিকট অভিমান প্রকাশ করিতেছেন। শ্রুতির যে মন্ত্রে বলা হইয়াছে—

'ওঁ পিতা নোঽসি
পিতা নোবোধি
ওঁ নমস্তেঽস্তু মা মা হিংসীঃ'

—সে মন্ত্রের উপাস্য সগুণ ঈশ্বর, কোন গুণাতীত পুরুষ নহেন।

ঈশ্বর গুপ্ত কিন্তু প্রাচীন যুগকেও সর্বাংশে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, নূতন যুগকেও সর্বান্তঃকরণে বরণ করিতে পারেন নাই।

আদি ব্রাহ্মসমাজের আলোচনা প্রসঙ্গে ঋষিকল্প শিক্ষাব্রতী রাজনারায়ণ বসুর নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি ভাগ্যবান পুরুষ। তিনি সতীর্থরূপে লাভ করিয়াছিলেন ভূদেব, মধুসূদন, প্যারীচরণ সরকার প্রভৃতি মনস্বী শিক্ষার্থিগণকে, শিক্ষকরূপে লাভ করিয়াছিলেন ডি এল রিচার্ডসনের ন্যায় সহৃদয় ও কাব্যরসিক অধ্যাপককে, বিদ্যাসাগর, মদনমোহন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতির সান্নিধ্যও তিনি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আর একটি বিশেষ সৌভাগ্য এই যে, তিনি জাতিবর্ণ-সম্প্রদায়-নির্বিশেষে সকল মানুষেরই শ্রদ্ধা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশ-প্রেম ও জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মধর্মকে 'উন্নত হিন্দুধর্ম' বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। বাংলা সাহিত্যেও তাঁহার দান সামান্য নহে। তাঁহার রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে 'ধর্মতত্ত্বদীপিকা', 'আত্মচরিত' এবং 'সেকাল ও একাল' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

যুগ-প্রতিনিধি বিদ্যাসাগর

সকলেই জানেন, পাশ্চাত্যের একজন মনস্বী পণ্ডিত বলিয়াছেন—'To be great is to be misunderstood!' কথাটি মহামানব বিদ্যাসাগর ও অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কেশবচন্দ্র সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

বাংলা ভাষায় বিদ্যাসাগরের চরিত-গ্রন্থের অভাব নাই,—তাঁহার একমাত্র ইংরেজি জীবন-চরিত এখন দুষ্প্রাপ্য, কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবন-দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া অনেকেই বিভ্রান্ত হইয়াছেন। ভবভূতির সংজ্ঞা অনুসারে যিনি লোকোত্তর পুরুষ, মধুসূদন একদিন যাঁহার সম্পর্কে বলিয়াছেন—

'The man I have appealed to has the wisdom of an ancient sage, the energy and enthusiasm of an Englishman and the heart of a Bengali mother.'

রবীন্দ্রনাথ যাঁহার 'অক্ষয়-মনুষ্যত্ব' ও 'অজেয় পৌরুষের' প্রশংসা করিয়াছেন এবং যাঁহাকে 'বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন, সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে ব্যুৎপন্ন হইয়াও এবং ধর্ম-বিপ্লবের যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও যিনি ধর্ম-প্রচারে বিন্দুমাত্র উৎসাহ প্রদর্শন করেন নাই, মাতা-পিতাকেই যিনি প্রত্যক্ষ দেবতা বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন,

লোককল্যাণ-ব্রতে যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাঁহাকে যাঁহারা একটিমাত্র বিশেষণে বিশেষিত করিতে চাহেন, তাঁহাদের বিচারবুদ্ধিকে বিশেষ প্রশংসা করা যায় না। শ্রদ্ধেয় রামেন্দ্রসুন্দর বলিয়াছেন, বিদ্যাসাগরের ফিলানথ্রপি ও পাশ্চাত্য জাতির ফিলানথ্রপি এক পদার্থ নহে। আমরাও বলি, বিদ্যাসাগরের হিউম্যানিজম্ ও পাশ্চাত্যের হিউম্যানিজম্ এক পদার্থ নহে।

বিদ্যাসাগর নাস্তিক (atheist) নহেন, অজ্ঞেয়বাদী (agnostic) নহেন, আবার জগৎ-কর্তার মঙ্গলময় বিধানেও পূর্ণ বিশ্বাসী নহেন। ধর্ম সম্পর্কে নানা মুনির নানা মত তাঁহাকে বিভ্রান্ত করিয়াছে, জগতে নির্মমতা দেখিয়া তিনি কখনও কখনও জগৎ-কর্তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও অভিমান প্রকাশ করিয়াছেন, আবার তিনিই পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন—'আমি ধর্মপ্রচার করি না বেতের ভয়ে। যাহা নিজে বুঝি না, তাহা অপরকে বুঝাইতে গিয়া কি শেষে যমদূতের হাতে মার খাইব ?' এই জন্য এক, অদ্বিতীয়, নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়াও তিনি ধর্ম সম্পর্কে প্রচলিত কুসংস্কারকে ব্যঙ্গ করিতেন। তিনি লোককল্যাণের জন্য যে সকল কর্ম করিয়াছেন, তাহা তাঁহার পরদুঃখকাতর হৃদয় হইতে স্বত-উৎসারিত হইয়াছে। সুতরাং গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের আদর্শ বা দার্শনিক ক্যাণ্টের Duty for

duty's sake নীতি তিনি গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

শিবচন্দ্রের জীবনকে যাঁহারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডিরোজিও, ডেভিড্ হেয়ার, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য তিনি দেবেন্দ্রনাথ অপেক্ষা ছয় বৎসরের এবং অক্ষয়কুমার ও বিদ্যাসাগর অপেক্ষা নয় বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। পরবর্তীকালে বাংলার একজন অসাধারণ মনস্বী সন্তান মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম-প্রচারে আত্ম-নিয়োগ করেন এবং ব্রাহ্মধর্মকে নব নব ভাবরসে পরিপুষ্ট করিয়া তোলেন। ইনি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত ও অসাধারণ বাগ্‌বিভূতির অধিকারী কেশবচন্দ্র সেন। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে একদিকে শিবচন্দ্রের, অপরদিকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল; এই পার্থক্যটুকু উপলব্ধি না করিলে গত শতাব্দীর বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকিবে।

অগ্নিমন্ত্রের উপাসক কেশবচন্দ্র

কেশবচন্দ্রের অধ্যাত্মচেতনার একটা উন্মেষ, ক্রমবিকাশ ও পরিণতি আছে। বৈষ্ণব ভাব-সাধনার উত্তরাধিকারী কেশব চতুর্দশ বৎসর বয়সেই অন্তরের

প্রেরণায় আমিষ আহার বর্জন করিয়াছিলেন। বালক কেশবচন্দ্র খেলাধূলার পরিবর্তে কীর্তনানন্দে নিমগ্ন হইতেন। তারপর, মহামানব যীশুর ভগবৎ-প্রেম ও মানব-প্রীতি তাঁহাকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে। তিনি ভাবাবিষ্ট অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেন জন দি ব্যাপটিস্টকে, যিনি পাপাচারী মানুষের জন্য আশার বাণী বহন করিয়া আনেন, 'Repent ye, for the kingdom of heaven is at hand'. তারপর তাঁহার দৃষ্টির সম্মুখে আবির্ভূত হন ভগবানের বার্তাবহ খ্রীষ্ট,—দৃষ্টি তাঁহার করুণাস্নিগ্ধ, কণ্ঠে তাঁহার শান্তির বাণী ; তিনি বলেন—'Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Blessed are the pure in spirit, for they shall see God.' তারপর তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া ওঠে সন্ত পলের মূর্তি, যিনি মহামানব ঈশার বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। খ্রীষ্টের দিব্যজন্ম ও দিব্য কর্মে তিনি বিশ্বাসী হন, তাই রাজা রামমোহনের মত খ্রীষ্টধর্মের অলৌকিকতা তিনি বর্জন করেন নাই।

আবার যেদিন তিনি মহর্ষির নিকট ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিলেন, সেদিন হইতে তাঁহার জীবনে এক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত হইল। তিনি প্রচণ্ড উৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করিলেন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্‌বিভূতি শ্রোতৃমণ্ডলীকে বিস্মিত করিল।

তিনি যখন ভাবাবিষ্ট ও আত্মসমাহিত হইয়া অগণিত শ্রোতৃমণ্ডলীর সম্মুখে অনর্গল বক্তৃতা করিতেন, তখন চতুর্দিকে এক সূচীভেদ্য নিস্তব্ধতা বিরাজ করিত। শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার বক্তৃতা শুনিতেন। কিন্তু অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কেশবচন্দ্র অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রেও কোন একটি ধ্রুব লক্ষ্যের দিকে স্থির থাকিতে পারিলেন না; তাই তাঁহার প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম নব নব ভাবরসে পরিপুষ্ট হইতে লাগিল।

পৃথিবীর সকল ধর্মপ্রবর্তক, সকল মহাপুরুষের বাণীর মধ্যেই এক নূতন তাৎপর্য তিনি আবিষ্কার করিলেন। যুগে যুগে ধর্মপ্রবর্তকগণ, বিধাতৃপ্রেরিত মহাপুরুষগণ, এমন কি, শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণ যে অগণিত মানুষের অন্ধতমসাচ্ছন্ন পথকে আলোকিত করেন, Greatmen নামক বক্তৃতায় সেই কথাটি তিনি তাঁহার অননুকরণীয় ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন। কেশবচন্দ্র তাঁহার জীবনবেদের একটি অধ্যায় 'অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা' এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

'জীবন-ভাগবতের তৃতীয় পরিচ্ছেদ, অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা। যদি জিজ্ঞাসা করি, হে আত্মন্! ধর্মজীবনের বাল্যকালে কি মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলে? আত্মা উত্তর দেয়,—অগ্নিমন্ত্রে। বাল্যকালাবধি আমি অগ্নিমন্ত্রের উপাসক, অগ্নিমন্ত্রেরই পক্ষপাতী। অগ্নির অবস্থাকে পরিত্রাণের

অবস্থা জ্ঞান করি।...এই ব্যক্তির জীবনে, গোড়া হইতে এ পর্যন্ত, এই উৎসাহ উদ্যমের অগ্নি ক্রমাগত জ্বলিতেছে। ইহা যে সাময়িক বীরত্বের ভাবে দেখা দিতেছে তাহা নয়॥ কখনও কখনও দেখা যাইতেছে, তাহা নয়। ধর্মের অভিধানে লেখা আছে, উত্তাপের অর্থই জীবন; উত্তাপের বিপরীত মৃত্যু! শরীর যদি সম্পূর্ণরূপে শীতল হইয়া পড়ে, চিকিৎসকেরা সিদ্ধান্ত করিবেন, মৃত্যু। কিছুমাত্র অগ্নি নাই, একটুও উত্তাপ নাই, দেখিলে বলিবেন, প্রাণ-অগ্নি নির্বাণ হইয়াছে। ধর্মজীবনেও উত্তাপ না থাকিলে মৃত্যু। এই জন্যই বাল্যকাল হইতে আমি অগ্নির পক্ষপাতী, অগ্নিমন্ত্রেই আমার দীক্ষা।'

মনে হয়, অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রেও কেশবচন্দ্রের প্রকৃতিতে একটা চাঞ্চল্য ছিল, এই জন্য কোন স্থির লক্ষ্যের দিকে তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে পারেন নাই। তিনি যে 'নববিধানের' বার্তা প্রচার করিয়াছিলেন, উহা নানা বাদ্যযন্ত্র হইতে উত্থিত ও নানা কণ্ঠ হইতে নিঃসৃত সঙ্গীতের মতো,—জরথুস্ত্র, বুদ্ধদেব, খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি মহামানবগণের স্মরণ, পূজন ও চিন্তনের মধ্য দিয়া তিনি ও তাঁহার অনুগামিগণ তাঁহাদের অধ্যাত্মজীবনকে নব নব ভাব-রসে পুষ্ট করিয়াছেন। মৃদঙ্গ ও করতালের মধুর ধ্বনিতে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারই নির্দেশে উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ

রায়, মৌলানা গিরিশচন্দ্র সেন ও রেভারেণ্ড প্রতাপচন্দ্র মজুমদার যথাক্রমে হিন্দুধর্ম ও ভারতীয় সংস্কৃতি, ইসলাম ধর্ম ও সংস্কৃতি এবং খ্রীষ্টধর্ম ও খ্রীষ্টীয় সন্তগণের বাণী প্রচারে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। ভগবান বুদ্ধের বাণী, শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনচরিত (ভক্তিচৈতন্যচন্দ্রিকা) এবং শিখধর্ম ও গ্রন্থসাহেবের প্রচারেও তাঁহার অনুগামীদের উৎসাহের অন্ত ছিল না। উপাধ্যায় গৌরগোবিন্দ, গিরিশচন্দ্র সেন ও ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল তাঁহাদের অকৃপণ দানে বাংলা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়াছিলেন।

সাধন-প্রণালীর ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে যুক্ত হইয়াছিলেন। ইহা উনিশ শতকের বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা। ধর্মসাধনার ক্ষেত্রে কেশবচন্দ্র যদি রহস্যবাদী বা মিষ্টিক না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহাদের মধ্যে এই 'মৈত্রীবন্ধন' সম্ভবপর হইত না। কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণ উভয়েরই ধ্যানে 'বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা' মিলিত হইয়াছিল কিন্তু তাঁহাদের সমন্বয়-সাধনার পদ্ধতি ছিল বিভিন্ন।

দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্র

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও আচার্য কেশবচন্দ্র উভয়েই বাংলার বরণীয় পুরুষ ও উনিশ শতকের বাংলার নব

জাগরণে উভয়েরই দান অপরিসীম, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে যে প্রকৃতিগত পার্থক্য ছিল, তাহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না। দেবেন্দ্রনাথ ছিলেন শান্তরসের উপাসক, তাঁহার মধ্যে হৃদয়াবেগ থাকিলেও ভাবপ্রবণতার অতিরেক বা আতিশয্য ছিল না। আর ভক্ত কেশবচন্দ্র ছিলেন অধ্যাত্মসাধনার ক্ষেত্রে নব নব রস-আস্বাদনের পক্ষপাতী, তিনি ছিলেন ভাব-প্রবণ 'মিষ্টিক'। দ্বিতীয়তঃ, উপনিষদের ঋষিগণ ও সূফী সাধকগণের ভাবধারায় নিষ্ণাত দেবেন্দ্রনাথ প্রকৃতির দৃশ্যে গন্ধে গানে অক্ষর পুরুষের লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া পুলকিত হইতেন, তিনি ভক্তের দৃষ্টি লইয়া প্রকৃতিগ্রন্থ পাঠ করিতেন, আর মহাপুরুষ যীশুর ভাব-ধারায় নিষ্ণাত কেশবচন্দ্র পাঠ করিতেন জীবন-গ্রন্থ। তাই তাঁহার মধ্যে পাপবোধ এমন প্রবল ছিল। বাংলা দেশের একজন মনস্বী লেখক বলিয়াছেন, কেশবচন্দ্রের মধ্যে যে পাপচেতনা ছিল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে তাহা কুত্রাপি দেখা যায় না। মহর্ষি মনে করিতেন, কেশব ও প্রতাপের চিন্তাধারায় খ্রীষ্টধর্মের প্রভাব এমন মাত্রাহীন হইয়া উঠিয়াছে যে, তাঁহারা জাতীয় ভাবধারা হইতে বিচ্যুত হইয়াছেন। আবার, সমাজসংস্কারের ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথের আগ্রহ কোন দিনই উদগ্র হইয়া দেখা দেয় নাই, এ বিষয়ে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল, কিন্তু কেশবচন্দ্রের মধ্যে সমাজ

সংস্কারের একটা প্রবল উন্মাদনা ছিল। এ সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুরূপ মত পোষণ করিতেন। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ মনে করিতেন, সমাজ-সংস্কারের জন্য পৃথক প্রয়াসের প্রয়োজন নাই, সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের আদর্শে যদি জাতিকে অনুপ্রাণিত করিয়া তোলা যায়, তবে সমাজের গ্লানি সহজেই দূরীভূত হইবে।

শিবচন্দ্রের ধর্মচিন্তা

শিবচন্দ্রের ধর্মচিন্তায় থিওডোর পার্কারের প্রভাব অতি বিপুল। থিওডোর পার্কার বলেন—

'Religion is the service of God by the normal use, development and enjoyment of every limb of the body, every faculty of the spirit, every power we are borr to or have acquired'.

ধর্মের এই সংজ্ঞায় ভক্তি বা প্রার্থনার কোন স্থান নাই। অক্ষয়কুমারও প্রধানত ধর্মের এই সংজ্ঞাই গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবশ্য, অক্ষয়কুমারের ন্যায় শিবচন্দ্রের মধ্যে অজ্ঞেয়বাদের দিকে কোন প্রবণতা ছিল না, প্রার্থনা বা উপাসনা যে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা তিনি স্বীকার করিয়াছেন। পরবর্তী

বঙ্কিমচন্দ্র গুরু-শিষ্যের কথোপকথনের মধ্য দিয়া ধর্মের যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, তাহার মূল সূত্র,—সর্ববৃত্তির অনুশীলন ও সামঞ্জস্য এবং বৃত্তিসমূহের ঈশ্বরমুখীনতা। বঙ্কিমচন্দ্রও মূলতঃ যুক্তিবাদী ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রচারিত ধর্মে কৃচ্ছ্রসাধনের কোন স্থান নাই, তাঁহার নিকট ধর্ম ও সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্বের আদর্শ ছিল অভিন্ন। কিন্তু কেশবচন্দ্রের ধর্মসাধনায় প্রজ্ঞাদৃষ্টি বা Intuition-এর একটা বিশেষ স্থান ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠেও আমরা ভারতীয় ঋষির কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই। তিনি বলিয়াছেন—'ধর্ম উপলব্ধির বস্তু, পাঠ বা বিচারের বস্তু নয়'।

কঠোপনিষদের ঋষি বলিয়াছেন—

'নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য
স্তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্‌॥

এই আত্মাকে অনেক উত্তম বচনের দ্বারা অথবা মেধার দ্বারা অথবা নানা শাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা লাভ করা যায় না। আত্মা যাঁহাকে বরণ করেন, তিনিই তাঁহাকে লাভ করেন, আর তাঁহার নিকটেই আত্মা নিজের স্বরূপ প্রকাশিত করেন।

অবশ্য উপনিষদের বাণীর সঙ্গে শিবচন্দ্রের পরিচয়

ছিল। তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত আত্মচরিতে লিখিয়াছেন—আমি শাক্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। বিবাহের পর সস্ত্রীক কুলগুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিয়া প্রতিদিন তাঁহার নির্দেশ অনুসারে মহাশক্তির উপাসনা করিতাম। যখন আমি হিন্দু কলেজে অধ্যয়ন করি, তখন ডিরোজিওর প্রভাবে হিন্দুধর্মের প্রতি আস্থাহীন হই, কিন্তু আমি নাস্তিক হই নাই।

১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরে অবস্থানকালে তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকা আমার হস্তগত হয়। আমি তখন হইতে ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হই। আমি পত্রিকাখানি নিয়মিত রূপে পাঠ করি এবং পরব্রহ্মের উপাসনায় প্রবৃত্ত হই। ধর্ম-প্রচারক ও সমাজ-সংস্কারক আচার্য কেশবচন্দ্রের প্রতিও আমার শ্রদ্ধা ছিল অপরিসীম। কিন্তু পরবর্তী কালে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের কোন কোন কার্যকলাপ এবং কেশবচন্দ্রের কোন কোন উপদেশের সঙ্গে আমি একমত হইতে পারি নাই। পরিশেষে কেশবচন্দ্রের কন্যার বিবাহকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার সহিত আমার তীব্র বিরোধ হয়। কেশবচন্দ্রের বিরোধী দল যে 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' স্থাপন করেন, আমিও তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলাম।

লোকশ্রেয়ের আদর্শ

শিবচন্দ্রের নিকট ধর্ম ও লোকশ্রেয়ের আদর্শ ছিল অভিন্ন। শিবচন্দ্রের জীবনের ব্রত ছিল,—জন্মভূমির সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ-সাধন; তাই স্বদেশের সর্ববিধ অভাব মোচন করিয়া, স্বদেশবাসীদিগকে শিক্ষা দীক্ষায় ও চরিত্রবলে উন্নত ও ধর্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলার জন্য তাঁহার প্রচেষ্টার বিরাম ছিল না। কোন্নগরের ইংরেজি ও বাংলা স্কুল, বালিকা-বিদ্যালয়, হোমিও-প্যাথিক ঔষধালয়, ডাকঘর ও সংগীত-বিদ্যালয় (অল্পকাল স্থায়ী), কোন্নগর হিতৈষিণী সভা (অল্পকাল স্থায়ী) প্রভৃতি এই কর্মবীরেরই অনলস কর্ম-প্রচেষ্টার ফল।

তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন, অদ্যকার যে শিশু, কল্যকার সে নাগরিক। The child of today is the citizen of tomorrow. কিন্তু সন্তানকে উত্তম নাগরিকরূপে গড়িয়া তুলিতে হইলে প্রত্যেক জননীরই শিশুপালন সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা প্রয়োজন। তাই তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গ্রন্থ অবলম্বনে 'শিশু-পালন' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। (প্রথম ভাগ, ১৮৫৭, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৬২)। প্রৌঢ়বয়সে পরলোক-তত্ত্ব অবগত হইবার জন্য তাঁহার মনে আগ্রহ জন্মে এবং এ বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গ্রন্থাদি পাঠ করেন। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এ বিষয়ে 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান' নামে একখানি

গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া তিনি 'হেয়ার প্রাইজ ফণ্ড'-এর পুরস্কার লাভ করেন।

বহু লোকহিতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। বেথুন সোসাইটি, এগ্রিকালচারাল সোসাইটি, ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি, সুরাপান নিবারণী সভা, কুমারী মেরী কার্পেণ্টার প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা, কেশবচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত ভারত সংস্কার সভা, ভারত সভা (১৮৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত) প্রভৃতি নানা সভার তিনি সভ্য ছিলেন।

শিবচন্দ্র একদিকে ছিলেন বহুভাষাবিদ্, অপর দিকে ছিলেন বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগী। বিজ্ঞানকে তিনি 'ঈশ্বরপ্রণীত পুরাণ' বলিয়া মনে করিতেন। তিনি প্রখর যুক্তিবাদী ছিলেন বলিয়াই পার্কারের ধর্মমত তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। শিবচন্দ্রের ধর্ম ছিল নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, কোনরূপ রহস্যবাদ বা মিস্টিসিজ্‌ম্ তিনি আশ্রয় করেন নাই। পার্কারের রচিত একটি প্রবন্ধ তিনি বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, প্রবন্ধটির নাম 'মহা-পুরুষ'। এই প্রবন্ধে পার্কার দেখাইয়াছেন, সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণেই কোন কোন জাতির মধ্যে মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তিনি খ্রীষ্টের দিব্য জন্মের কথা, এমন কি, দিব্য কর্মের কথাও অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি যে সময়ে প্রবন্ধটি রচনা করেন, সে সময় জীববিদ্যায়

পারদর্শী পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করিয়াছেন যে বংশানুক্রমের বা hereditary transmission-এর দ্বারা মানুষের সমস্ত আচরণের ব্যাখ্যা করা যায়। বৈজ্ঞানিকদের এই সকল অতিশয়োক্তির দ্বারা পার্কার অনেক সময়ে বিভ্রান্ত হইয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

'যেমন দুর্বল ও অনুপযুক্ত মৃত্তিকায় বৃহৎ বৃক্ষ কখনও জন্মে না, সেইরূপ প্রত্যেক মহাপুরুষ অসাধারণ বংশ ভিন্ন জন্ম পরিগ্রহ করেন না।' পার্কারের সুস্পষ্ট অভিমত এই —মহাপুরুষগণ নীচ জাতি হইতে কখনও উৎপন্ন হয়েন না।

যাঁহারা এই মতবাদ গ্রহণ করিবেন, তাঁহারা কবীর, রুইদাস প্রভৃতি সাধকগণের দিব্য চেতনা এবং কৃষক কন্যা জোয়ান অব আর্কের দিব্যানুভূতির কী ব্যাখ্যা দিবেন?

ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ

মহানির্বাণতন্ত্রে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের যে আদর্শ আছে, শিবচন্দ্র সেই আদর্শ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিতেন। আমরা সংসারে স্থিতপ্রজ্ঞ বা স্থিতধী পুরুষ বড় একটা দেখিতে পাই না, কারণ কঠোর প্রযত্ন সত্ত্বেও মানুষ চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতে পারে না, কিন্তু যিনি যে পরিমাণে এই

লক্ষ্যের নিকটবর্তী হইতে পারেন, তিনি সেই পরিমাণে আমাদের বরণীয়। আমাদের শাস্ত্রকারেরা বলেন, মানুষ জন্মজন্মান্তরের সাধনার মধ্য দিয়াই একদিন পূর্ণতা বা নিঃশ্রেয়স লাভ করেন। এইরূপ জীবন্মুক্ত পুরুষদের কোন কর্ম থাকে না, তাঁহারা শুধু লোকহিতের জন্য কর্ম করেন। শিবচন্দ্র স্থিতধী না হইলেও ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া রোগযন্ত্রণা ও দুঃসহ শোকের জ্বালা অপরিসীম ধৈর্যের সহিত সহ্য করিতে চেষ্টা করিতেন। তিনি ছিলেন আদর্শ স্বামী, আদর্শ পিতা, আদর্শ বন্ধু, প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথের জন্য তাঁহার সেবার হস্ত সর্বদা প্রসারিত থাকিত। ভাগ্যবশে, তিনি আদর্শ সহধর্মিনী লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিয়া নিজের মনের মত করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।

শিবচন্দ্র ছিলেন সামাজিক ও বন্ধুবৎসল মানুষ। সেকালের বাংলার বহু স্মরণীয় ও বরণীয় পুরুষের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন, ইঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন তাঁহার সতীর্থ। এই বরেণ্য ও কৃতী পুরুষদের মধ্যে প্যারীচাঁদ মিত্র, রামতনু লাহিড়ী, রাজা দিগম্বর মিত্র, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্যারীচরণ সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়,

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, হরিমোহন সেন, আনন্দমোহন বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, শিবনাথ শাস্ত্রী, দুর্গামোহন দাস, ভগবানচন্দ্র বসু, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, সেবাব্রত শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসন্ন রায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শিবচন্দ্র আপন চরিত্র-মাধুর্যে ইঁহাদের সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন।

শিবচন্দ্র ছিলেন মিতাচারী, মিতাহারী, মিতভাষী; 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং' এই উক্তিটি তাঁহার জীবনে সম্পূর্ণ সার্থক হইয়া উঠিয়াছিল। শিবচন্দ্রের চরিতকার লিখিয়াছেন—'ধর্মবিষয়ে শিবচন্দ্রের কোনরূপ সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিক, যে কোনও ধর্মাবলম্বী হউন না কেন, শিবচন্দ্রের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন। তাঁহার মুখে ধর্মের কথা বড় একটা শুনা যাইত না, কিন্তু তাঁহার হৃদয়-কন্দরে ধর্মভাব নিরন্তর জাগরূক থাকিত'। এই প্রসঙ্গে শিবচন্দ্রের চরিতকার তাঁহার দিনলিপি হইতে তাঁহার ধর্মচিন্তার নিদর্শন উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারী শিবচন্দ্র লিখিয়াছেন—

'Our days are gliding rapidly, but we make no preparation for our homeward journey.'

১২ই জানুয়ারী তারিখের দিনলিপিতে তিনি লিখিয়াছেন—

'We should not despair, being the sons of an all-loving Father, who is sure to hear our prayer in its proper time. Want of faith is the cause of all our disappointments.

ঈশ্বরের মঙ্গলময় বিধানে ও পরলোকের অস্তিত্বে প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়াই তিনি ধীরে ধীরে মহাযাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। পারস্যের সুপ্রসিদ্ধ কবির ন্যায় তিনিও মৃত্যুকে সম্বোধন করিয়া বলিতে পারিতেন—

'ওহে মৃত্যু, তুমি মোরে কি দেখাও ভয় ?
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়।

* * *

যে অম্লান কুসুমের মধুপান-তরে,
লোলুপ নিয়ত মম মনো-মধুকরে,
যে নিত্য উদ্যানে সেই পুষ্প বিরাজিত,
হে মৃত্যু, তাহার তুমি সরণি নিশ্চিত।

(কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার : সদ্ভাবশতক)

শিবচন্দ্রের ধর্মচিন্তায় যেমন থিওডোর পার্কারের প্রভাব ছিল, তেমনই ফরাসী ধর্মযাজক ফেনেলোঁ'রও প্রভাব ছিল। ভগবান সর্বদাই ভক্তের প্রার্থনা পূরণ করেন,

পাপাচারী ব্যক্তিও কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হইলে তিনি তাহাকে কোলে তুলিয়া লন, ইহাই ছিল তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয়। শিবচন্দ্রের চরিতকার লিখিয়াছেন—

"টেলিমেকস-রচয়িতা প্রসিদ্ধ ফরাসী ধর্মযাজক ফেনেলোঁ। প্রার্থনা-সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, প্রার্থনায় বেশি কথা বলিবার প্রয়োজন নাই। 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক' বলিলেই হইবে। শুভ সঙ্কল্প করা, হৃদয়কে ঈশ্বরাভিমুখে উন্নত করা, নিজের দুর্বলতার জন্য বিলাপ করা, পুনঃ পুনঃ স্বীয় অবাধ্যতা স্মরণ করিয়া অনুশোচনা করা,—ইহাই প্রার্থনা"।

শিবচন্দ্রের জীবনী-রচয়িতা দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার দৈনন্দিন প্রার্থনায় ফেনোলোঁর উপদেশের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। এ কথাও হয় তো সত্য যে, শিবচন্দ্রের ধর্মচিন্তায় ভারতীয় ঋষিগণ অপেক্ষা পাশ্চাত্য মনীষীদিগের চিন্তার প্রভাব ছিল গভীরতর।

অধ্যাত্মবিজ্ঞান বা Spiritualism-এর প্রতি শিবচন্দ্রের কৌতূহল চিরদিন জাগ্রত ছিল। তিনি যে বাংলা ভাষায় 'অধ্যাত্মবিজ্ঞান' রচনা করিয়াছিলেন, সে কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পরলোকবাসী আত্মাদিগের উক্তিতে তিনি স্বয়ং বিশ্বাসী ছিলেন, কিন্তু যাঁহারা অবিশ্বাসী বা সংশয়াত্মা, তাঁহাদের সহিত তিনি তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন নাই।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০এ এপ্রিল তারিখে পরলোকবাসিনী এমা হার্ডিঞ্জ (মার্কিণ মহিলা) ইংলণ্ডের ক্লিভ্ল্যাণ্ড হলে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। সেই বক্তৃতা হইতে শিবচন্দ্র দশটি আধ্যাত্মিক আদেশ ও দশটি আচরণ-বিধি সঙ্কলন করিয়া বাংলা অনুবাদসহ প্রকাশিত করেন। শিবচন্দ্র বলেন, এই উপদেশসমূহ সার্বজনীন, যাঁহারা পারলৌকিক আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারাও এই বিধিসমূহ পালন করিলে পরম কল্যাণ লাভ করিবেন। আধ্যাত্মিক দশটি আদেশের একটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

'এক অথবা অল্প সংখ্যক ব্যক্তির অপেক্ষা অধিকাংশ ব্যক্তির মঙ্গল শ্রেষ্ঠতর জানিবে, এবং যে সকল স্থলে সমাজের স্বার্থের সহিত তোমার নিজের বা স্বজনের স্বার্থের বিরোধ হইবে, সে সকল স্থলে অধিকাংশের কল্যাণার্থ আপনার স্বজনের স্বার্থ পরিত্যাগ করিবে।'

ইহাই ভগবান মনুর নির্দেশ, ভগবদ্গীতার লোকসংগ্রহের ও মহানির্বাণতন্ত্রের লোকশ্রেয়ের আদর্শ, মিল্প্রবর্তিত হিতবাদের মূল কথা। মানুষকে প্রতিনিয়ত কর্ম করিতে হইবে 'বহুজনহিতায় চ বহুজনসুখায় চ', ইহা ভারতেরও মর্ম-বাণী।

আমরা সকল দেশের সকল মানুষের পালনীয় দশটি আচরণবিধিও নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

(১) মিতাচারী হইবে। (২) ন্যায়পরায়ণ হইবে। (৩) বাক্যে ও কার্যে ধীরতা অবলম্বন করিবে। (৪) বাক্যে ও কার্যে সত্যকে অবলম্বন করিবে। (৫) চিন্তায়, বাক্যে ও কর্মে হৃদয়ের উদারতা রক্ষা করিবে। (৬) আর্ত ও বিপন্ন ব্যক্তিগণের প্রতি দয়ালু হইবে। (৭) অপরের উপকারের জন্য ত্যাগস্বীকার বা দুঃখবরণ করিবে। (৮) দৃঢ়চরিত্র হইবে ও সর্বপ্রকার অন্যায়ের প্রতিবাদ করিবে। (৯) পরিশ্রমী হইবে এবং অন্যের সেবায় কিয়ৎ পরিমাণ সময় ব্যয় করিবে। (১০) সর্বভূতে প্রীতিমান হইবে এবং সর্বমানবে প্রীতি যাহাতে বর্দ্ধিত হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করিবে।

লক্ষ্য করিবার বিষয়, শিবচন্দ্র ব্যক্তিগত জীবনে এই দশটি বিধি পালন করিয়া চলিতেন। ভগবান মনুও ধর্মের দশটি লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সার্বজনীন ধর্মের দশটি লক্ষণ হইতেছে—

'ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
ধীবিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্' ॥

অর্থাৎ—ধৈর্য, ক্ষমা, মনঃসংযম, অস্তেয় (অচৌর্য), দেহ ও মনের শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, জ্ঞান, ব্রহ্মবিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ, এই দশটি ধর্মের লক্ষণ।

আমরা এবার শিবচন্দ্রের কয়েকটি বাণী উদ্ধৃত করিতেছি।

(ক) প্রজ্ঞা বিনা প্রেম অন্ধের ন্যায় কার্য করে।

(খ) আত্মার সহিত আত্মার সম্মিলনই যথার্থ উদ্বাহ, এবং দাম্পত্য প্রেম সর্বাগ্রে তাহাই বাঞ্ছা করে। উহা দ্বারা দুইটি আত্মা একাত্মা হইয়া যায়···কিন্তু উক্ত প্রেম প্রজ্ঞার সাক্ষাৎ কর্তৃত্ব ও উপদেশ দ্বারা সঞ্চালিত ও শাসিত না হইলে বিষম ও মন্দ ফল উৎপন্ন করে।

(গ) ঈশ্বরের নিয়মপালনই পুণ্য ও তাহা ভঙ্গ করিলেই পাপ। যাঁহারা শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করতঃ ধর্মোন্নতি সাধন করেন তাঁহারা মহাভ্রমে পতিত হন এবং তাঁহাদিগকে আংশিক পাপী জ্ঞান করা যাইতে পারে। (বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বেও অনুরূপ উক্তি আছে।)

(ঘ) কি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি, কি উৎকৃষ্ট বৃত্তি সকলেরই আতিশয্য অনিষ্টকর।

তুলনীয় : বুদ্ধদেবের মধ্যপন্থা। মনস্বী এরিস্টটল পুণ্য বা Virtueর সংজ্ঞা দিয়াছেন : Virtue is the mean between two extremes অথবা Virtue lies in the golden mean. এরিস্টটলের মতে আতিশয্যই পাপ, মধ্যপন্থাই কল্যাণের পন্থা। ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন—যাঁহারা যোগী হইতে চান, তাঁহারা যথাকালে মিতাহারী হইবেন ও পরিমিত নিদ্রা যাইবেন। পরবর্তীকালে মনস্বী ট্রাইন বলিয়াছেন—'The middle path is the great solution of life ,

neither asceticism on the one hand nor license or perverted use on the other.

(ঙ) মনুষ্যকে বহুসংখ্যক তারযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে; কারণ যেমন উক্ত যন্ত্রের সমুদায় তার সামঞ্জস্যরূপে প্রতিঘাত হইলে সুমধুর বাদ্য উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার মানব-প্রকৃতির সমুদায় বৃত্তি সামঞ্জস্যরূপে সঞ্চালিত হইলে মনুষ্য সমস্ত কর্তব্য সাধনপূর্বক আত্মপ্রসাদ ও বিশুদ্ধ সুখশান্তি লাভ করে।

(চ) সমস্ত বৃত্তিকে স্ব স্ব কার্যে এরূপে নিয়োজিত করিতে হইবে যে, তদ্দ্বারা একটি মহৎ সামঞ্জস্য সম্পাদিত হয়, যাহাতে সমষ্টির জন্য কোন অংশের অথবা অংশের জন্য সমষ্টির হানি না হয়। (থিয়োডোর পার্কারের নিকট হইতে শিবচন্দ্র এই সামঞ্জস্যের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন।)

এই সামঞ্জস্যের আদর্শ ভক্তিরসে অভিষিক্ত হইয়া কত রমণীয় হইতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতের ঋষিগণও এই সামঞ্জস্যের আদর্শই স্থাপন করিয়াছেন, তাই তাঁহারা ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণের মধ্যে কোন বিরোধ কল্পনা করেন নাই। মহর্ষি কণাদ্ বলিয়াছেন—যাহার দ্বারা অভ্যুদয় (পার্থিব উন্নতি) ও নিঃশ্রেয়স (মুক্তি) লাভ হয়, তাহাই ধর্ম। এই জন্যই প্রাচীন ঋষিগণ ধর্ম, অর্থ,

কাম ও মোক্ষ এই চারটিকে পুরুষার্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় একালের বহু মনীষী মনে করেন, গীতায় শ্রীভগবান কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও ভক্তির মধ্যে সামঞ্জস্যের আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন।

কিন্তু ধর্মসাধনায় বিচার-বুদ্ধির স্থান থাকিলেও উহার এমন একটি অন্তরঙ্গ দিক আছে যাহা অনুভূতি-গম্য। ভারতবর্ষের ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মবাদিনী ঋষিগণ, কঠোরতপা যোগী ও তপস্বিগণ, ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত রসিক জন এবং খ্রীষ্টীয় অ-লোকপন্থী বা মিষ্টিক সাধক-সাধিকাগণ ও ইরাণের সূফী সাধকগণ, ইঁহাদের সকলের নিকটই ধর্ম অনুভূতির বিষয়; আর এই অনুভূতির রাজ্যে যাঁহারা প্রবেশ করেন, তাঁহারা হন সত্যদ্রষ্টা; একমাত্র তাঁহারাই বলিতে পারেন, 'আমি সেই মহান পুরুষকে জানিয়াছি, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাঁহার সঙ্গে প্রেমের বন্ধনে যুক্ত হইয়াছি'। পৃথিবীতে হয় তো কোন দিন এরূপ দিব্যভাবের সাধকের অভাব হইবে না। তাই উনিশ শতকের অষ্টম দশক হইতেই দক্ষিণেশ্বরের নিরক্ষর খ্যাপা সাধকটি বহু শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালীকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রের জীবিত-কালেই সংশয়াত্মা অথচ জিজ্ঞাসু নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসিয়া ধীরে ধীরে নবজন্ম লাভ করিতেছিলেন।

আমরা কেশবচন্দ্র ও শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়-সাধনার

কথা বলিয়াছি। কেশবচন্দ্রের সমন্বয়-সাধনার আদর্শ পাই শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকে—

'অণুভ্যশ্চ মহদ্ভ্যশ্চ শাস্ত্রেভ্যঃ কুশলো নরঃ।
সর্ব্বতঃ সারমাদদ্যাৎ পুষ্পেভ্য ইব ষট্‌পদঃ'॥

ভৃঙ্গ যেমন সকল কুসুম হইতেই সার গ্রহণ করে, সেইরূপ ধীর ব্যক্তি ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল শাস্ত্র হইতেই সার গ্রহণ করিবেন।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বিচিত্র সাধনার মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া এই সত্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, সকল সাধকেরই গম্যস্থল এক। অবশ্য বিচিত্র উপাসনা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া নানা মতের মধ্যে ঐক্য স্থাপনের প্রয়াস শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় মহামানবের পক্ষেই সম্ভবপর।

রাশিয়ার মনস্বিনী মহিলা ম্যাডাম ব্লাভাট্‌স্কি ও আমেরিকার কর্ণেল অলকট্ ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইতে ও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে ব্রহ্মবিদ্যা সমিতি বা থিয়সফিকাল সোসাইটির প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহাদের চিন্তাধারা কয়েকজন বরেণ্য বাঙ্গালীকে প্রভাবিত করে। তাঁহাদের মতবাদ লইয়া আমরা এখানে আলোচনা করিব না, আমরা শুধু এইটুকু বলিয়া রাখি যে, তাঁহারাও ধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শ এবং বেদান্ত দর্শনের ভিত্তির উপর 'ভ্রাতৃত্বের' নূতন আদর্শ স্থাপন করেন।

উনিশ শতকের শেষ পাদে বাংলা দেশে ধর্মান্দোলন

নানা খাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই সময়েই কৃষ্ণানন্দ স্বামী, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, শশধর তর্কচূড়ামণি প্রভৃতি ধর্মপ্রচারকগণের আবির্ভাব ঘটে।

কিন্তু মহামানব শিবচন্দ্র দেবের ধর্মসাধনার আদর্শ ছিল 'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্যপ্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব'। এ বিষয়ে মহর্ষির সঙ্গে তাঁহার মতের ঐক্য ছিল। তিনি ছিলেন প্রধানতঃ কর্মী; তিনি অবশ্য ভক্তও ছিলেন, কিন্তু তাঁহার ভক্তিসাধনায় ভাবোন্মাদনার স্থান ছিল না। সেবাব্রত শশিপদের মত তাঁহার কর্মের পরিধি বিস্তৃত ছিল না, কিন্তু জন্মভূমির কল্যাণচিন্তায় তিনি চিরদিন অনলস, অতন্দ্রিত ছিলেন এবং কর্ম-সাধনায় অসাধারণ সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি সূর্যের মত নিখিল জগতে আলোক বিকীর্ণ না করিলেও মৃন্ময় প্রদীপের ন্যায় আপনার চতুর্দিকে স্নিগ্ধ আলোক বিচ্ছুরিত করিয়াছিলেন। তাই এই মহামানবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসিয়া রবীন্দ্রনাথের 'কণিকা'র একটি ক্ষুদ্র কবিতাই বারংবার মনে পড়িয়া যায়।

পরিশিষ্ট

১

শিবচন্দ্র দেব

এই সাধুপুরুষ কলিকাতার চারি ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গাতীরস্থিত কোন্নগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়া বহুকাল সেই গ্রামকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। রেলওয়ে ষ্টেশন, পোষ্ট অফিস, ইংরাজী স্কুল, বাঙ্গালা স্কুল, ডিসপেন্সারী, ব্রাহ্মসমাজ প্রভৃতি কোন্নগরের উন্নতির যে কিছু চিহ্ন অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার সকলি ইঁহারই চেষ্টার ফল। ইঁহার কথা কোন্নগরের লোক বহুদিন ভুলিতে পারিবে না। ইঁহার স্বলিখিত সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত হইতে ইঁহার জীবনবৃত্তান্ত সংকলন করিতেছি।

১৮১১ সালে ২০ জুলাই কোন্নগর গ্রামে শিবচন্দ্র দেবের জন্ম হয়। ইঁহার পিতা ব্রজকিশোর দেব, কমিসরিয়েটে সরকারের কাজ করিতেন। ঐ কাজে তখন বিলক্ষণ আয় ছিল। সুতরাং ব্রজকিশোর দেব সে সময়কার একজন সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তিনি বহুকাল সরকারী কাজ করিয়া বৃদ্ধাবস্থায় পেন্‌শন্ লইয়া কার্য হইতে অবসৃত হন। সংসারের শৃঙ্খলা, সুবন্দোবস্ত ও সকল কার্যের সুনিয়মের জন্য তিনি গ্রামের

মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি সর্বদা একটী ঘড়ি নিকটে রাখিতেন, এবং তদনুসারে সকল কাজ যথা সময়ে করিতেন। তাঁহার সমুদয় কাজ কর্ম ধার্মিক হিন্দু গৃহস্থের আদর্শস্থানীয় ছিল।

শিবচন্দ্র ব্রজকিশোরের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। প্রথমে তদানীন্তন রীতি-অনুসারে গ্রাম্য পাঠশালাতে শিবচন্দ্রের শিক্ষারম্ভ হয়। দশবৎসর বয়সে তিনি গৃহে বসিয়াই একজন আত্মীয়ের সাহায্যে ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন। একাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়। তৎপরে কিছুদিন গোলমালেই কাটিয়া যায়। সে সময়ের মধ্যে তাঁহার বিদ্যাশিক্ষার বিষয়ে কেহই বিশেষ মনোযোগ করেন নাই।

ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে তাঁহার বিশেষ আগ্রহে তাঁহার পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় আনেন, এবং ১৮২৫ সালের ১লা আগষ্ট দিবসে, চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সে তাঁহাকে হিন্দু-কলেজে ভর্তি করিয়া দেন। হিন্দুকলেজে তিনি ছয় বৎসর পাঁচ মাস কাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এবং প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া ১৬ টাকা বৃত্তি পাইয়াছিলেন। এই সময়েই তিনি ডিরোজিওর শিষ্যদলভুক্ত হইয়া তাঁহার যৌবন সুহৃদগণের সহিত সম্মিলিত হন। সে বন্ধুতার স্মৃতি চির-দিন তাঁহার হৃদয়ে লেখা ছিল। উত্তরকালে যখন তিনি পলিতকেশ বৃদ্ধ, তখনও তাঁহার নিকটে বসিলে সময়ে

সময়ে দেখা যাইত যে, ডিরোজিও-র সামান্য সামান্য উক্তিগুলি তাঁহার মনে উজ্জ্বল রহিয়াছে, যেন কল্যকার ঘটনা।

কলেজে পাঠের সময়ে পরলোকগত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের পিতৃব্য হরিমোহন সেন মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুতা জন্মে ; এবং সে সময়ে উভয় বন্ধুতে মিলিয়া আরব্য উপন্যাস বাঙ্গালাতে অনুবাদ করিয়া মুদ্রিত করেন।

কলেজ ছাড়িয়া তিনি কয়েক বৎসর প্রথমে জি, টি, সার্ভে অফিসে ৩০৲ টাকা বেতনে কম্পিউটারের কাজ করেন। তৎপরে ১৮৩৮ সালে ডেপুটী কালেক্টারের পদে উন্নীত হইয়া বালেশ্বর গমন করেন। ১৮৪৪ সালে বালেশ্বর হইতে মেদিনীপুরে বদলী হন। ১৮৫০ সালে কলিকাতার সন্নিকটস্থ আলিপুরে চব্বিশ পরগণার ডেপুটী কালেক্টর হইয়া আসেন।

১৮৫৭ সালে যখন সিপাই বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তখন শিবচন্দ্রবাবুকে অকারণ একটু বিপদে পড়িতে হইয়াছিল। সে সময়ে একদিন তিনি রেলগাড়িতে কলিকাতায় আসিতেছিলেন। সেই গাড়িতে কয়েকজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক ছিলেন। কথা প্রসঙ্গে মিউটীনীর কথা উপস্থিত হয়। তখন শিবচন্দ্রবাবু স্বাধীনভাবে স্বীয় মত প্রকাশ করেন। সেই ইংরাজ ভদ্রলোকগুলি

কলিকাতাতে পৌঁছিয়াই এই কথোপকথনের বিষয় গবর্ণমেণ্টের গোচর করেন। এই সামান্য কারণে গবর্ণমেণ্ট তাঁহার নিকট কৈফিয়ৎ চাহিয়া পাঠান।

ইহার পরে তিনি আরও অনেক পদে উন্নীত হইয়া দক্ষতার সহিত অনেক কার্য করিয়া ১৮৬৩ সালে বিষয়-কর্ম হইতে অবসৃত হন। অপরাপর লোকের পক্ষে বিষয়কর্ম হইতে অবসৃত হওয়ার অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিশ্রাম সুখ ভোগ করা কিন্তু শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের পক্ষে তদ্বিপরীত ঘটিল। পেনশন্ লইয়া কোন্নগরে বাস করিয়াই তিনি স্বীয় বাসগ্রামের সর্ববিধ উন্নতি সাধনে মনোনিবেশ করিলেন।

পূর্ব হইতে স্বদেশের উন্নতি-সাধনে তিনি মনোযোগী ছিলেন। মেদিনীপুরে বাসকালে সেখানে একটী ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপরে কলিকাতাতে বদলী হইয়াই স্বীয় বাসগ্রামের উন্নতির দিকে তাঁহার দৃষ্টি পতিত হয়। তৎপূর্বে ১৮৫২ সালে গ্রামবাসি-গণকে সমবেত করিয়া কোন্নগর হিতৈষিণী সভা নামে একটী সভা স্থাপন করেন। ১৮৫৪ সালে তাঁহারই প্রযত্নে ও তাঁহার বন্ধুগণের সাহায্যে একটী ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হয়। ইহার পূর্বে উক্ত গ্রামে হার্ডিঞ্জ বাহাদুরের সময়ের স্থাপিত একটী মডেল বাঙ্গালা স্কুল মাত্র ছিল। ইংরাজী স্কুল স্থাপিত হওয়ার পর ১৮৫৬ সালে গবর্ণমেণ্ট

বাঙ্গালা স্কুলটী তুলিয়া দেন। কিন্তু গ্রামমধ্যে একটী বাঙ্গালা স্কুল থাকা আবশ্যক বোধে ১৮৫৮ সালে প্রধানতঃ তাঁহার উদ্যোগে আবার একটী বাঙ্গলা স্কুল স্থাপিত হয়।

স্কুল দুইটী স্থাপন করিয়া তিনি গ্রামবাসিগণের ব্যবহারার্থ একটী সাধারণ পুস্তকালয়ের অভাব অনুভব করিতে লাগিলেন। তদনুসারে প্রধানতঃ তাঁহার চেষ্টাতে ১৮৫৮ সালে একটী সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হইল।

এখানেই তাঁহার শ্রমের বিরাম হইল না। হিন্দু-কলেজে পাঠকালে তিনি স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বড়ই অনুভব করিয়াছিলেন; এবং ১৮২৬ সালে হুগলী জেলার গোপালনগরের বৈদ্যনাথ ঘোষের কন্যার সহিত তাঁহার পরিণয় হইলে, তিনি স্বীয় বালিকা পত্নীকে বাঙ্গালা লিখিতে ও পড়িতে শিখাইতে আরম্ভ করেন। প্রৌঢ়াবস্থাতেও তাঁহার সে উৎসাহ মন্দীভূত হয় নাই। যখন যেখানে গিয়াছেন, সর্ব্বত্রই পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া আপনার কন্যাদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। তৎপরে মহাত্মা বেথুন কলিকাতাতে তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ বালিকাবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলে, দলপতিদিগের মহা আন্দোলন সত্ত্বেও তিনি আপনার এক কন্যাকে ঐ স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিলেন। স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে এরূপ যাঁহার

উৎসাহ, তিনি যে স্বীয় বাসগ্রামের বালিকাগণের শিক্ষার উপায় বিধান না করিয়া স্থির থাকিবেন ইহা সম্ভব নহে। ১৮৫৮ সালে তিনি গবর্ণমেণ্টের নিকট এই প্রস্তাব করিলেন যে গবর্ণমেণ্ট যদি বালিকাস্কুলের গৃহনির্মাণার্থে ৫০০ পাঁচশত টাকা দেন, তাহা হইলে তিনি নিজে আর ৫০০ পাঁচশত টাকা দিতে পারেন, এবং তাহার ব্যয় নির্বাহার্থ গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৪৫ টাকা দিলে তিনি ১৫ টাকা চাঁদা তুলিতে পারেন। অনেক লেখা-লিখির পরে গবর্ণমেণ্ট সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন।

শিবচন্দ্রবাবু তাহাতে নিরুদ্যম না হইয়া, স্বীয় চেষ্টায়, স্বীয় অর্থে, স্বীয় ভবনে, ১৮৬০ সালে একটী বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কিছুদিন পরে তাঁহারই প্রদত্ত ভূমিখণ্ডের উপরে, তাঁহারই ব্যয়ে ঐ বিদ্যালয়ের জন্য একটী গৃহ নির্মিত হইল। তাহাতে বালিকা-বিদ্যালয় উঠিয়া গেল এবং এখনও সেইখানে আছে।

কেবল তাহা নহে, ১৮৬২ সালে তিনি শিক্ষিতা নারীদিগের ব্যবহারার্থ "শিশুপালন" নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া মুদ্রিত করিলেন। পরে ১৮৬৭ সালে "অধ্যাত্মবিজ্ঞান" নামে প্রেততত্ত্ব বিষয়ে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

অগ্রে কোন্নগরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির ষ্টেশন ছিল না। কোন্নগরবাসীদিগকে হয় বালি ষ্টেশনে,

না হয় শ্রীরামপুর ষ্টেশনে গিয়া গাড়িতে উঠিতে হইত; তাহাতে তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধা হইত। এই অসুবিধা দূর করিবার মানসে তিনি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নিকটে কোন্নগরে একটী ষ্টেশন করিবার জন্য আবেদন করেন। ঐ আবেদনের ফলস্বরূপে ১৮৫৬ সালে কোন্নগরে ষ্টেশন খোলা হয়।

তাঁহারই আবেদন অনুসারে ১৮৫৮ সালে কোন্নগরে একটী ডাকঘর স্থাপিত হয়।

কোন্নগরে ম্যালেরিয়া জ্বর দেখা দিলে, তাঁহারই প্রযত্নে গবর্ণমেণ্ট একটী চ্যারিটেবল্ ডিস্পেনসারি স্থাপন করেন। তিনি সেজন্য একটী বাড়ী ডিস্পেন্সারির ব্যবহারার্থ বিনা ভাড়াতে দেন। ঐ ডিস্পেন্সারির দ্বারা কোন্নগরের লোকের মহোপকার সাধিত হইয়াছিল। ম্যালেরিয়ার প্রকোপ কিঞ্চিৎ হ্রাস হইলে, ১৮৮১ সালে গবর্ণমেণ্ট ঐ ঔষধালয়টি তুলিয়া দেন। ১৮৮৩ সালে শিবচন্দ্রবাবু নিজের ব্যয়ে একটি হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপন করেন। উহা হইতে প্রতিদিন প্রাতে দরিদ্রদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হইত। এই কার্য্যটি তিনি শেষ দিন পর্য্যন্ত চালাইয়াছিলেন।

ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার বিষয়েও তিনি উদাসীন ছিলেন না। তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত আত্মজীবন-চরিতে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে, যৌবনকালে যখন তিনি

ডিরোজিও-র শিষ্যদলভুক্ত ছিলেন, তখন হইতেই তাঁহার প্রাচীনধর্মের প্রতি বিশ্বাস বিলুপ্ত হয়; এবং তিনি অন্তরে অন্তরে একেশ্বরবাদী হন। কিন্তু বহু বৎসর কর্মসূত্রে নানাস্থানে ভ্রমণ করিবার সময়ে সে অন্তরের বিশ্বাস অন্তরেই থাকে; তদনুসারে কার্য করিবার বিশেষ সুবিধা পান নাই। পরে ১৮৪৩ সালে যখন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়া ইহাকে বলশালী করিয়া তোলেন এবং স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়ের সম্পাদকতার অধীনে যোগ্যতাসহকারে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' সম্পাদিত হইতে থাকে, তখন ১৮৪৪ সালে, তিনি উক্ত পত্রিকার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইয়া পরব্রহ্মের উপাসনা আরম্ভ করেন। সেই সময়ে তিনি বালেশ্বর হইতে বদলী হইয়া মেদিনীপুরের ডেপুটী কালেক্টর হইয়া আসেন।

ব্রাহ্মধর্মের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধিত হওয়াতে তিনি ১৮৫৬ সালে মেদিনীপুরে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন; এবং উৎসাহ সহকারে ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে প্রবৃত্ত হন। ১৮৫০ সালে কলকাতার সন্নিহিত আলিপুরে যখন চব্বিশ পরগণার ডেপুটী কালেক্টর হইয়া আসেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরেই বিধিপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করিয়া আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরূপে পরিগণিত হন। কেবল তাহা নহে, আপনার স্ত্রী পুত্র পরিবার সকলকে ঐ ধর্মের

আশ্রয়ে আনিবার জন্য ব্যগ্র হন ; এবং ঈশ্বর প্রসাদে সে চেষ্টাতে কৃতকার্যও হইয়াছিলেন।

১৮৬৩ সালে রাজকার্য হইতে অবসৃত হইয়া যখন স্বীয় বাসগ্রামে বাস করিলেন, তখন সেখানে একটি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মধর্ম সাধন ও প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এই সমাজ অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। ১৮৬৬ সালে উন্নতিশীল ব্রাহ্মদল আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে তিনি ঐ দলের সহিত হৃদয়ের যোগ স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের অবলম্বিত পদ্ধতি অনুসারে আপনার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। তৎপরে ১৮৭৮ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ যখন স্থাপিত হইল, তখন তিনি ইহার নেতৃবর্গের মধ্যে অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন, বহুবৎসর ইহার সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। ইহার উন্নতি বিষয়ে তাঁহার অবিশ্রান্ত মনোযোগ ছিল। ব্রাহ্মপদ্ধতি অনুসারে পুত্রের বিবাহ দেওয়াতে তাঁহার আত্মীয় স্বজন ও তাঁহার স্বগ্রামবাসী বন্ধুগণ তাঁহাকে একঘরে করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে তিনি একদিনের জন্য দুঃখিত ছিলেন না, বা একদিনের জন্য গ্রাম-বাসীদিগের হিতেচ্ছা তাঁহার হৃদয়কে পরিত্যাগ করে নাই। তিনি সমভাবে সকলের কল্যাণ চিন্তা করিতেন এবং গ্রামের সর্ববিধ উন্নতিতে সহায় হইবার চেষ্টা করিতেন।

জীবনের অবসানকালে তিনি কলিকাতাতে বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে আসিয়া প্রতিষ্ঠিত হন। এইখানেই ১৮৯০ সালের ১২ই নবেম্বর বুধবার মানবলীলা সম্বরণ করেন।

এইরূপ সাধুপুরুষের অবসানকাল যেরূপ হয় শিবচন্দ্র দেবের অবসানকাল সেইরূপই হইয়াছিল। ভাঁটার জল যেমন অল্পে অল্পে নামিয়া যায়, তাঁহার জীবননদীর জল যেন তেমনি অল্পে অল্পে কমিয়া গেল। জীবনের সঙ্গিনী সহধর্মিনীর ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া, পুত্র কন্যা দৌহিত্রগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, বন্ধুবান্ধবের সহিত দেশহিতকর নানা বিষয়ে আলাপ করিতে করিতে শান্তিতে শান্তিধামে প্রস্থান করিলেন। তিনি আমাদের মধ্যে সদাশয়তা, মিতাচারিতা, পরহিতৈষণা, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও ধর্মভীরুতার আদর্শস্বরূপ ছিলেন। সত্য সত্যই ডিরোজিও বৃক্ষের এই ফলটি অতি মধুর হইয়াছিল।

—শিবনাথ শাস্ত্রী

২

মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব

মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব বিগত শতকের একজন স্মরণীয় ব্যক্তি। কোন্নগরে এক সম্ভ্রান্ত কায়স্থ বংশে তাঁর জন্ম। হিন্দু কলেজ (স্থাপিত ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ) থেকে 'ইয়ং বেঙ্গল' যে ছাত্রদল শিক্ষান্তে জীবনক্ষেত্রে নানা দিকে প্রতিষ্ঠা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন শিবচন্দ্র তাঁদেরই অন্যতম। শিবচন্দ্রের সহপাঠী বন্ধুবর্গের মধ্যে উল্লেখ যোগ্য হলেন রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র (পরে বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ), কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি। হিন্দু কলেজে শিবচন্দ্র অধ্যাপক ডিরোজিও-র সংস্পর্শে আসেন। ভারত-পথিক রামমোহনের আদর্শে শিবচন্দ্র অনুপ্রাণিত হন। তাঁর জীবনে Renaissance-এর সুফল বিশেষ ভাবে বিধৃত হয়েছিল। সে কালে নবপ্রবর্তিত ইংরেজ শিক্ষার ফলে ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ এবং স্বদেশের প্রতি উন্নাসিক মনোভাব ছাত্রদের মধ্যে দেখা দিয়াছিল। শিবচন্দ্র ছিলেন এ সবের উর্ধ্বে। বরং ইংরেজি শিক্ষার সুফলটুকু তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া সেকশনে রেলপথ খোলা হয়। ১৮৫৭র সিপাহী বিদ্রোহ। একদিন শিবচন্দ্র রেলে

কোন্নগর থেকে কলকাতা যাচ্ছিলেন। তখন সিপাহী বিদ্রোহের কথা লোকমুখে ফিরছে। এমন সময় নব-প্রবর্তিত রেলগাড়িতে ভ্রমণকালে শিবচন্দ্রের সহযাত্রী ছিলেন কয়েকজন ইংরেজ। কথায় কথায় মিউটিনির প্রসঙ্গ উঠল। তর্ক বাঁধল। তাঁহাদের একতরফা কথার উত্তরে শিবচন্দ্র বললেন, "কোনও এক পক্ষের দোষ দেখলে চলবে না। সিপাহীরা যখন ধর্মমূলক কুসংস্কার-বশতঃ দাঁত দিয়ে টোটা কাটতে অস্বীকার করেছিল, তখন তাদেরকে ও কাজ করতে বাধ্য করা গভর্নমেণ্টের অন্যায় ও অনুচিত হয়েছে।" শিবচন্দ্রের বক্তব্য শুনে ইংরেজ সহযাত্রিগণ তাঁকে মিউটিনি সমর্থকরূপে গভর্নমেণ্টের কাছে অভিযুক্ত করলেন। শিবচন্দ্র দেব আপন স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য গভর্নমেণ্টের কাছে কৈফিয়ৎ দিতে বাধ্য হলেন এবং গভর্নমেণ্ট তাঁকে সতর্ক করে দিয়ে রেহাই দিলেন।

আপন জন্মস্থান কোন্নগরের উন্নতির জন্য শিবচন্দ্র বড়ই ব্যাকুল ছিলেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১ মে শিবচন্দ্র কোন্নগর হাই স্কুলটি স্থাপন করেন। শ্রীঅরবিন্দ-র পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষ কোন্নগর হাই স্কুলের ছাত্র হিসাবেই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন। এই স্কুলে সেকালে যাঁরা শিক্ষকতা করেছেন তাঁদের মধ্যে দু'জন হলেন সিটি কলেজের উমেশচন্দ্র দত্ত এবং অমৃতবাজার পত্রিকার

শিশিরকুমার ঘোষ। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য শিবচন্দ্র দেব ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ এপ্রিল কোন্নগরে বালিকা বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। মেরী কার্পেণ্টার ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কোগরে এসেছিলেন এবং স্কুল পরিদর্শন করে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর Six Months in India বইয়ে এই ভ্রমণের কথা আছে। স্কুল ছাড়া কোন্নগর রেল স্টেশন, পোষ্ট অপিস, সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতি শিবচন্দ্রের উদ্যোগে স্থাপিত হয়। মোট কথা, কোন্নগরের যা কিছু গৌরবের বস্তু তা সবই শিবচন্দ্র দেবের কীর্তি। নিজ গ্রামের উন্নতিকল্পে শিবচন্দ্র দেবের কার্যাবলীর পিছনে সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা ছিল শিবচন্দ্র দেবের পত্নী অম্বিকা দেবীর। সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও তিনি কলকাতাবাসী হওয়া পছন্দ করেন নি। নিজ গ্রাম কোন্নগরের জন্য তাঁর অন্তরে স্নেহধারা চিরপ্রবাহিত ছিল'।

শিবচন্দ্র দেবের কৃতিত্বের কথা বলতে গিয়ে আরও বলার আছে। ক্ষোভের সঙ্গে এ কথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর কোন স্বীকৃতি নেই ও সুকুমার সেনের গ্রন্থেও এঁর কোন উল্লেখ নেই। বাঙলা গদ্যের পদাঙ্ক সংকলনকারী অধ্যাপক শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মহাশয়ও তার গ্রন্থে শিবচন্দ্র দেবের ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে লেখা বাঙলা গদ্য রচনা Specimen হিসাবে স্থান

দেননি। Renaissance এর সুফল শিবচন্দ্রের দৃষ্টিকে সময় অতিক্রমকারী করেছিল। তাই একথা জেনে অবাক হতে হয় যে আজ থেকে বহুপূর্বে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে শিবচন্দ্র দেব এগুরু কোম্ব প্রমুখ পাশ্চাত্ত্য লেখকদের বই-এর সাহায্য নিয়ে বাঙলা ভাষায় "শিশুপালন" নামে একটি বই লেখেন। বাংলা ভাষায় সেকালে শিশুপালনের বিধি নিয়ে কোনো বই ছিল না। অর্থাৎ প্রসূতি এবং শিশুপালনের ব্যাপারেও যে শেখাবার বস্তু আছে, তা আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে শিবচন্দ্র দেবই প্রথম বললেন। এ দেশে এ ব্যাপারে তাঁকে Pioneer বা পথিকৃৎ বলা উচিত। সেকালে প্রসূতির গৃহব্যবস্থা নিয়েই দেশবন্ধুর পিতৃব্য দুর্গামোহন দাশের সঙ্গে আপন পরিবারের লোকদের মতান্তর দেখা দেয় এবং এজন্য দুর্গামোহন গৃহত্যাগ পর্যন্ত করেছিলেন। "নীলদর্পণ"-এর লেখক দীনবন্ধু মিত্রের (১৮২৯-৭৩) "সুরধুনী কাব্যে" গঙ্গা-তীরবর্তী স্থানের মধ্যে কোন্নগরের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :—

"কায়স্থ নিবাস কোন্নগর বিশাল
স্থিত যথা শিবচন্দ্র পুণ্যের প্রবাল,
শিশুপালনের পিতা, প্রশান্ত স্বভাব
সুশিক্ষিতা ছয় মেয়ে, ভারতীর ভাব।"

তাই ঐতিহাসিক বিচারে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে শিবচন্দ্রের অবদান অচিরে স্বীকার করা কর্তব্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে শিবচন্দ্র দেবের বিশেষ সখ্য জন্মেছিল। মহর্ষি বয়সে শিবচন্দ্র অপেক্ষা ছয় বছরের ছোট ছিলেন, তাই তাঁকে অগ্রজতুল্য মনে করতেন। মহর্ষির উদ্যোগে প্রকাশিত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা শিবচন্দ্র দেবের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার পরে শিবচন্দ্র দেবের প্রতি মহর্ষিদেব আকৃষ্ট হন। গঙ্গায় বজরায় বেড়াতে বেড়াতে তিনি মাঝে মাঝে কোন্নগরে শিবচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। কোন্নগরে মহর্ষিদেব উপস্থিত হলে একটি ভাবগম্ভীর উপাসনা সভা অনুষ্ঠিত হত। মহর্ষি এই সভায় সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ ভাষণ দিতেন।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজ ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের বাৎসরিক উৎসবে মহর্ষিদেব একাধিকবার আচার্যের কাজ করেছেন। একবার মহর্ষিদেব সন্ধ্যাকালে শিবচন্দ্রের বাড়িতে আসেন। সঙ্গে ছিলেন বেচারাম চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথের গৃহশিক্ষক অযোধ্যানাথ পাকড়াশী ও পণ্ডিত আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ। বৈঠকখানার বদলে শিবচন্দ্রের বাড়ির পুকুরের বাঁধানো ঘাটে মহর্ষিদেব বসলেন। সঙ্গে আরও ছিলেন প্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায় এবং পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাজনা এবং বিষ্ণুরামের গান সকলের প্রিয় ছিল।

মহর্ষির সঙ্গে শিবচন্দ্রের একটা পারিবারিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের নতুন মন্দির গঠন কার্যে মহর্ষির কাছ থেকে আশাতীত অর্থসাহায্য পেয়েছিলেন শিবচন্দ্র। কোন্নগরের এই মন্দিরে একবার পিতৃবন্ধু শিবচন্দ্রের অনুরোধে স্বরচিত কয়েকটি ব্রহ্মসঙ্গীত গেয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। শিবচন্দ্রের সঙ্গে মহর্ষির নৈকট্যহেতু শিবচন্দ্রের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধা করতেন না। পুকুরের ঘাটে বিশ্রাম শেষে মহর্ষিদেবের জন্য একটি বড় জামবাটিতে করে প্রায় তিন সের পবিমাণ দুধ আনা হত। মহর্ষিদেব তা পান করতেন এবং রাতের আহার শেষ হত।

মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ শিবচন্দ্রের চেষ্টায় ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। পরে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর গবর্ণমেন্ট স্কুলে প্রধান শিক্ষক থাকাকালে ঐ ব্রাহ্মসমাজের মাধ্যমে সমগ্র জেলার উন্নতির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে মেদিনীপুরের অগ্রগমনের পেছনে রাজনারায়ণ বসুর অবদান আছে। সেই সঙ্গে বলি, রাজনারায়ণ বসুর কাছে পথ সুগম করে রাখার কৃতিত্ব শিবচন্দ্র দেবের। অর্থাৎ সন্ধ্যের আলো জ্বালাবার পল্‌তে ভোরবেলায় পাকানো হয়েছিল শিবচন্দ্রের হাতে।

—নীরদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

৩

শিবচন্দ্র দেব

কোন্নগরের সুবৃহৎ দেবপরিবারের যিনি প্রতিষ্ঠাতা, তাঁহার নাম নিধিরাম দেব। নিধিরামের সাত পুত্র ও তিন কন্যা ; তন্মধ্যে পঞ্চম পুত্রের নাম ব্রজকিশোর। ব্রজকিশোরের তিন কন্যা ও চারি পুত্রের সর্বকনিষ্ঠ মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব।

ইং ১৮১১ (বাং সন ১২১৮) সালের ২০শে জুলাই (৬ই শ্রাবণ) তারিখে শনিবারে কোন্নগর গ্রামে শিবচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। সে সময়ে কোন্নগর গ্রামে বাঙ্গালা শিক্ষার জন্য এখনকার মত কোনও বিদ্যালয় ছিল না। ব্রজকিশোর পুত্রের শিক্ষার জন্য একজন গুরুমহাশয়কে নিযুক্ত করিয়া বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন, শিবচন্দ্র তাঁহার নিকট সামান্যরূপ বাঙ্গলা লিখিতে পড়িতে ও অঙ্ক কষিতে শিখেন। শিবচন্দ্রের বয়স যখন প্রায় দশ বৎসর, তখন তিনি বাড়ীতে এক আত্মীয়ের নিকট অল্প অল্প ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করেন।

একাদশবর্ষ বয়সে শিবচন্দ্র মাতৃহীন হন কিন্তু বাটীর অন্যান্য মহিলাগণের স্নেহে ও তাঁহাদের সমবেত যত্নে, বালক শিবচন্দ্র মাতৃবিয়োগের দুঃখ অনুভব করিতে পান

নাই। এই জন্য তিনি চিরকাল স্ত্রীজাতির প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান ছিলেন; কি বাল্যকালে, কি যৌবনে, কি প্রাচীনাবস্থায় সর্বদা স্ত্রীজাতির কল্যাণসাধনে উৎসাহী ছিলেন। নারীদের সুখবিধান ও উন্নতিসাধনের উপায় করিতে পারিলে তিনি বিশেষ আনন্দ বোধ করিতেন।

জননীর মৃত্যুর পর সাংসারিক বিশৃঙ্খলার জন্য দুই বৎসর শিবচন্দ্রের শিক্ষার ব্যাঘাত ঘটে। পরে কলিকাতায় ভাল ভাল ইংরাজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং সেখানে ইংরাজী শিখিবার বিশেষ সুবিধা, এই সংবাদ পাইয়া কলিকাতায় গিয়া লেখাপড়া শিখিবার ইচ্ছা শিবচন্দ্রের মনে প্রবল হইয়া উঠিল।

ছাত্রজীবন

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে, ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে শিবচন্দ্র কলিকাতায় আসেন এবং হাটখোলায় রীড্ সাহেবের বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু সে স্কুলের পড়াশুনার ব্যবস্থায় তাঁহার মন উঠিল না।

এজন্য আট মাস পরে উক্ত বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া শিবচন্দ্র ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট তারিখে, চতুর্দশ বৎসর বয়সে হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হইলেন। হিন্দু কলেজে তখন সর্বশুদ্ধ দশটি শ্রেণী ছিল।

শিবচন্দ্র যখন হিন্দু কলেজে পড়িতেন তখন উহা প্রধানতঃ বেসরকারীভাবে পরিচালিত হইত এবং তখন উহাকে এঙ্গ্লো-ইণ্ডিয়ান কলেজ বলা হইত। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট হিন্দুকলেজের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। বর্তমান হিন্দুস্কুল হিন্দু কলেজের নিম্ন-বিভাগের এবং বর্তমান প্রেসিডেন্সি কলেজ উক্ত কলেজের উচ্চ বিভাগের নামান্তর ও রূপান্তর মাত্র। শিবচন্দ্র হিন্দু কলেজের সপ্তম শ্রেণীতে প্রবেশ করিয়া সর্বসমেত ছয় বৎসর পাঁচ মাস কলেজে কাটাইয়াছিলেন। কোন্ বৎসর কোন্ শ্রেণীতে পড়িয়াছিলেন তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :—

ইং সাল		শ্রেণী	অধ্যয়নকাল
১৮২৫	...	সপ্তম	পাঁচ মাস আগষ্ট হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত
১৮২৬	...	পঞ্চম	এক বৎসর
১৮	...	চতুর্থ	এক বৎসর
১৮২৮	...	তৃতীয়	এক বৎসর
১৮২৯	...	দ্বিতীয়	এক বৎসর
১৮৩০ ও ১৮৩১	...	প্রথম	দুই বৎসর

এই তালিকায় দেখা যাইবে যে, শিবচন্দ্র কলেজে ভর্তি হইয়া পাঁচ মাসের মধ্যেই এরূপ উন্নতি করিয়াছিলেন যে সপ্তম হইতে একেবারে পঞ্চম শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন। তিনি প্রত্যেক শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষায়

উচ্চস্থান অধিকার করিতেন এবং পারিতোষিক পাইতেন।

শিবচন্দ্র যখন চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র, তখন তাঁহার একজন পরম হিতকারী বন্ধু ও শিক্ষক লাভ হইয়াছিল। তিনি আর কেহই নহেন,—সেই অসাধারণ প্রতিভাশালী, ছাত্রসুহৃদ ফিরিঙ্গি যুবক শিক্ষক ডিরোজিও, যিনি প্রায় শতবর্ষ পূর্বে, চারিবৎসর মাত্র হিন্দুকলেজে শিক্ষকতা করিয়া, এদেশে উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের ইতিহাসের সহিত তাঁহার অমর নাম চিরদিনের জন্য গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন।

ডিরোজিওর সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কীর্তি এই যে, তিনি তাঁহার বাঙ্গালী ছাত্রমণ্ডলীকে চিরপ্রচলিত কুসংস্কারের অন্ধকার ভেদ করিয়া, সর্ববিষয়ে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে শিখাইয়াছিলেন, এবং নির্ভীকহৃদয়ে সত্যের অনুসন্ধান ও সেই অনুসারে কার্য করিতে প্রেরণা জাগাইয়া, তাহাদের মানসিক ও নৈতিক জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ছাত্রমণ্ডলীকে এরূপ স্নেহের বন্ধনে বাঁধিয়াছিলেন যে, তাহারা তাঁহার সঙ্গকে একটা লোকদুর্লভ সম্পদ বলিয়া মনে করিত। বস্তুতঃ ডিরোজিওর ন্যায় সুদক্ষ, সত্যপরায়ণ ও সহৃদয় শিক্ষক একান্ত দুর্লভ।

যে সকল ছাত্র প্রতিনিয়ত ডিরোজিওর সঙ্গলোলুপ

ছিলেন, তন্মধ্যে শিবচন্দ্র আত্মজীবনীতে এই কয়জন বন্ধু ও সতীর্থের নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, হরচন্দ্র ঘোষ, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী, প্যারীচাঁদ মিত্র ও হরিমোহন সেন।

কলেজে অধ্যয়নের শেষ দুই বৎসর শিবচন্দ্র মাসিক ১৬৲ টাকা বৃত্তি পাইতেন। প্রাপ্ত ১৬৲ টাকা হইতে যাহাকে যাহা দিলে ভাল হয়, সর্বাগ্রে তাহারই ব্যবস্থা করিয়া, পরে নিজের অত্যাবশ্যক অভাবগুলি মোচন করিতেন; কিন্তু সে ব্যয় বিষয়ে আপনার আহারাদি কি পরিধেয় ইত্যাদির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। একটি পয়সা কখনও অকারণে ব্যয় করিতেন না। বেশভূষা বা আমোদ প্রমোদে কখনও অনর্থক সামান্য অর্থও ব্যয় করিতেন না।

বৃত্তির ১৬৲টি টাকা লইয়া যে তরুণ যুবক বিদ্যালয়ে পড়িতে পড়িতে এরূপ বিবেচনার সহিত অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা করিতে পারেন, তিনি যে পরে যথেষ্ট অর্থোপার্জন করিয়া বিপন্ন আত্মীয়গণের এবং আর্ত ও দীনদুঃখীজনের অভাব মোচনের জন্য ব্যগ্র হইবেন, ইহা আর বিচিত্র কি?

শিবনাথের সতীর্থ বন্ধুগণের মধ্যে অনেকে মস্ত-

মাংসের ভক্ত ছিলেন; মদ্যমাংস না খাওয়া তাঁহারা কুসংস্কার বলিয়া গণ্য করিতেন। শান্তস্বভাব শিবচন্দ্র স্বভাবতই স্বল্পাহারী ছিলেন; প্রচুর পরিমাণে আহার, কিংবা মাংস প্রভৃতি গুরুপাক দ্রব্য আকণ্ঠ ভোজন করা তাঁহার অভ্যাস ছিল না। তিনি কখনও সুরাপান করিতেন না। একবার কয়েকজন বন্ধু মিলিত হইয়া সুরাপানের জন্য শিবচন্দ্রকে অত্যন্ত পীড়াপীড়ি করেন। শিবচন্দ্র অসম্মতি জানাইয়াও সহজে বন্ধুগণের হস্ত হইতে নিস্তার পান নাই। তাঁহাকে একবিন্দু সুরা বলপূর্বক পান করাইবার আয়োজন হইল। কিন্তু বলপ্রয়োগ করিয়াও প্রবল প্রতিজ্ঞাপরায়ণ ও দৃঢ়চিত্ত শিবচন্দ্রকে কিছুতেই বন্ধুরা সুরা পান করাইতে পারেন নাই।

বিবাহ ও পত্নীর শিক্ষা

তৎকালপ্রচলিত প্রথানুসারে, ব্রজকিশোর দেব মহাশয় শিবচন্দ্রের পঞ্চদশবর্ষ বয়সে, ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে (বাং ১২৩৩ সালের বৈশাখ মাসে) তারকেশ্বরের নিকটবর্ত্তী গোপালনগর গ্রামনিবাসী সম্পন্ন গৃহস্থ বৈদ্যনাথ ঘোষ মহাশয়ের নবমবর্ষীয়া দ্বিতীয়া কন্যা অম্বিকার সহিত পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।

শিবচন্দ্র যখন হিন্দু কলেজের অধ্যয়ন করিতেন সেই সময় হইতেই তিনি স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ও

উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। স্ত্রী যে স্বামীর জীবন-ব্রতের প্রধান সহায় এবং তাঁহার প্রত্যেক মহদনুষ্ঠানের ও উচ্চচিন্তার সমভাগিনী, শিবচন্দ্র প্রথম যৌবনেই ইহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।

প্রথম পরিচয়েই তিনি তাঁহার অশিক্ষিতা পত্নীকে লেখাপড়ার উপকারিতা বুঝাইয়া দেন এবং তিনি লেখাপড়া শিখিলে তাঁহার স্বামী তাঁহার উপর কতদূর সন্তুষ্ট হইবেন তাহাও বলেন।

শিবচন্দ্রের বুদ্ধিমতী বালিকা ভার্যা প্রধানতঃ স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য সর্বপ্রথমে বিদ্যা শিক্ষা করিতে সম্মত হন, কিন্তু যখন তিনি বর্ণমালা শিখিয়া শব্দ লিখিতে শিখিলেন, তখন তাঁহার প্রবাসী স্বামীকে একদিন পত্র লিখিতে পারিবেন, এই আশা তাঁহার প্রাণে জাগিল, এবং এই আশার প্রেরণাতেই তিনি প্রাণপণে লেখাপড়া শিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং সেজন্য সকল গঞ্জনা, লাঞ্ছনা ও কষ্ট নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন।

শিবচন্দ্রের গৃহিনীর শিক্ষার শেষ এখানেই হয় নাই। তিনি এরূপ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন যে, সমসাময়িক বঙ্গসাহিত্যের প্রায় কোনও উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তাঁহার অপঠিত ছিল না; যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ প্রভৃতি অতি দুরূহ গ্রন্থ এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও বিবিধার্থ-সংগ্রহ প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর মাসিক পত্রিকা তিনি সহজেই পাঠ

করিতেন। তাঁহার মেধা এবং স্মরণশক্তি এরূপ ছিল যে তিনি এই সকল পঠিত গ্রন্থের অনেকাংশ অতি প্রাচীন বয়সেও ভুলিয়া যান নাই।

কর্ম্মজীবন

শিবচন্দ্র ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ২০শে ডিসেম্বর তারিখে হিন্দুকলেজ পরিত্যাগ করিয়া ত্রিশ টাকা বেতনে সার্ভেয়ার জেনেরালের অফিসে কর্ম্মে নিযুক্ত হন। ছয়মাস পরে, ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই হইতে শিবচন্দ্রের বেতন ১০ টাকা বৃদ্ধি হইয়াছিল। ঐ অফিসে প্রায় ছয় বৎসর কাজ করার পর বোর্ড অফ রেভিনিউর সুপারিসে, গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ডেপুটি কালেক্টারের পদে নিযুক্ত করেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে জরিপের পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া রেভিনিউ সার্ভে (রাজস্ব জরিপ) বিভাগের অধীন বা নিম্নতন শাখায় কর্ম্ম পাইবার যোগ্য হইয়াছিলেন।

১৮৩৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারী শিবচন্দ্র দেব কটক (বর্তমান উড়িষ্যা) প্রদেশে বালেশ্বরে ডেপুটি কালেক্টারের পদে নিযুক্ত হন। শিবচন্দ্র ঐ জেলায় বিভিন্ন স্থানে ছয় বৎসরের অধিককাল রাজস্বের বন্দোবস্ত (Settlement) ও পুনর্গ্রহণ (Resumption) কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। বালেশ্বরে থাকিতেই, শিবচন্দ্র ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে ডেপুটি

কালেক্টরদিগের তৃতীয় হইতে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হইয়াছিলেন।

১৮৪৪ খৃষ্টাব্দের মে মাসে তিনি মেদিনীপুরে বদলি হইলেন। ঐ জেলায় তিনি পাঁচ বৎসরের উপর সদর মহল সমূহের রাজস্ব বিভাগের বিবিধ কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে শিবচন্দ্র তৎকালীন প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হন এবং পরবৎসর জানুয়ারী মাসে মেদিনীপুর হইতে ২৪ পরগণায় বদলি হন।

কর্মজীবনে শিবচন্দ্র বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার উর্দ্ধতন রাজপুরুষেরা তাঁহার কার্যে কিরূপ সন্তুষ্ট ছিলেন, তাহা বহু প্রশংসাসূচক মন্তব্যের মধ্যে নিম্নে উদ্ধৃত কালেক্টর বেলী সাহেবের মন্তব্য হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

'I do not know a Deputy Collector who would have done the same duty with so much clearness and success to his superiors and so little annoyance to those with whom he has to deal.

ন্যায়পরায়ণতা শিবচন্দ্রের অস্থিমজ্জাগত গুণ ছিল; তিনি গবর্ণমেণ্টের প্রিয়পাত্র হইবার আকাঙ্ক্ষায় রাজস্ব বৃদ্ধির দিকে অযথা দৃষ্টি রাখিয়া কখনও বিচারক্ষেত্রে প্রজার প্রতি লেশমাত্র ন্যায়বিরুদ্ধ আচরণ করেন নাই;

গবর্ণমেণ্টের জন্য ভূমিক্রয়ও নিরপেক্ষভাবে ও ন্যায্য মূল্যে করিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রের বিচারে ও অমায়িক আচরণে মুগ্ধ হইয়া বিচারার্থী সকলেই মুক্তকণ্ঠে তাঁহার গুণকীর্তন করিত। তাঁহার নির্দেশের বিরুদ্ধে অতি অল্প সংখ্যক আপীল উপস্থাপিত হইয়াছিল।

শিবচন্দ্র ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদিগের প্রথম শ্রেণীতে ৭০০ টাকা বেতনে উন্নীত হইয়াছিলেন। কিন্তু কয়েক বৎসরের অতিরিক্ত পরিশ্রমে শিবচন্দ্রের স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়াতে, তিনি ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি তারিখে, একাদিক্রমে একত্রিশ বৎসর চাকুরীর পর মাসিক ২৩০৷৷০ টাকা পেন্‌সনে রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স বাহান্ন বৎসরেরও কম ছিল।

সমাজসেবা

স্বগ্রামের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে কৃতসঙ্কল্প শিবচন্দ্রের উৎসাহে ও উদ্যোগে ১৮৫২ সালে ১১ জুলাই, কোন্নগর গ্রামবাসী-দিগের একটি সভায় গ্রামের নানাবিধ উন্নতির উদ্দেশ্যে "কোন্নগর হিতৈষিনী সভা" নামে একটি সভা স্থাপিত হয়।

মহাত্মা শিবচন্দ্র কোনও বিষয়ে নিজের প্রাধান্য দেখাইতে ভালবাসিতেন না। তিনি এই সভার

একমাত্র উদ্যোক্তা হইয়াও সভাপতিত্ব গ্রহণ করেন নাই, কেবল ধনরক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র দেব সভার সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

"হিতৈষিনী সভা" গ্রামের রাস্তা মেরামত, অত্যাবশ্যক স্থলে সাঁকো নির্মাণ, দরিদ্রদিগকে সাহায্য দান, দস্যুভয় নিবারণের জন্য সর্দার পাইক নিযুক্ত করা, বাঙ্গালা পাঠশালার জীর্ণ সংস্কার, ইংরাজী বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের জন্য অর্থদান, মাদকদ্রব্যের দোকান উচ্ছেদের চেষ্টা প্রভৃতি বিবিধ হিতকর অনুষ্ঠান দ্বারা সাধ্যমত স্বীয় নামের সার্থকতা প্রমাণ করিয়াছিল।

ঐ সভা তিন বৎসরের অধিক কাল জীবিত ছিল না। কিন্তু মহাত্মা শিবচন্দ্র তাহাতে নিরুৎসাহ না হইয়া নিজের ঐকান্তিক চেষ্টায় ও অর্থব্যয়ে কয়েক বৎসরের মধ্যেই একে একে কোন্নগরের প্রায় সকল অভাব মোচনে কৃতকার্য হইয়াছিলেন।

পূর্বে কোন্নগরে ইংরাজী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না; বালকদিগকে শ্রীরামপুর অথবা উত্তরপাড়ায় যাইতে হইত। এই অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে শিবচন্দ্র নিজেই কোন্নগর হিতৈষিণী সভার একটি অধিবেশনে গ্রামে একটি ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, এবং এজন্য তিনি স্বয়ং একখণ্ড ভূমি দান করিতে

স্বীকৃত হন। বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণের জন্য জনসাধারণের নিকট চাঁদা সংগ্রহ করা হয় এবং হিতৈষিণী সভা একশত টাকা দান করিয়াছিলেন। আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস বিদ্যালয় গৃহনির্মাণ বাবদ ব্যয়ভারের গণনীয় অংশ শিবচন্দ্র নিজে বহন করিয়াছিলেন। শিবচন্দ্রই প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং ইহা তাঁহার একটি অক্ষয় কীর্তি।

এই বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তিনি কোন্নগর ও তৎপার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির যে কি উপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। ১৮৫৪ সালের ১লা মে, এই বিদ্যালয়ের পাঠ আরম্ভ হয়। প্রথমে ইহা গবর্ণমেণ্টের নিকট কোনরূপ সাহায্য পায় নাই ; ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই নবেম্বর হইতে ইহা গবর্ণমেণ্ট সাহায্যকৃত বিদ্যালয় বলিয়া পরিগণিত হয় এবং প্রায় প্রথম হইতেই এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় বলিয়া গণ্য হয়।

কোন্নগরের ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার সাত আট বৎসর পূর্বে, লর্ড হার্ডিঞ্জের আদেশানুসারে বঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন পল্লীগ্রামে যে সকল বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল, কোন্নগর গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা পাঠশালা তাহার অন্যতম। ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট এই পাঠশালা উঠাইয়া দেন ; কিন্তু শিবচন্দ্র ও তাঁহার বন্ধুগণের চেষ্টায়

কোন্নগরে একটি বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিত হয় এবং উহা কিছু গভর্ণমেণ্ট সাহায্যও পায়। এই পাঠশালার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব এখন লোপ পাইয়াছে। শিবচন্দ্রের আমলে ইহা বহুবার বাৎসরিক ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় বঙ্গের সমস্ত পাঠশালার মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

কোন্নগরে একটি সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপিত হইলে, শিক্ষার বিশেষ উন্নতি হইবে এই ভাবিয়া ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হইবার অল্পদিন পরেই শিবচন্দ্র উক্ত উদ্দেশ্য সাধনে উদ্যোগী হইলেন। শিবচন্দ্র প্রস্তাবিত পুস্তকালয়ের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং সেই সময়েই ইংরাজি বিদ্যালয়ের দ্বিতলে পুস্তকালয়ের জন্য দুইটি কক্ষও নির্মাণ করিলেন। শিবচন্দ্রের বহুদিনের অক্লান্ত চেষ্টার ফলে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রিলে কোন্নগর সাধারণ পুস্তকালয় প্রথম খোলা হয়।

শিবচন্দ্র নিজের ব্যবহারের জন্য বহু বৎসর ধরিয়া যে সকল মূল্যবান পুস্তক সংগ্রহ করিয়াছিলেন, নব-প্রতিষ্ঠিত পুস্তকালয়ের বীজস্বরূপ তৎসমুদয় সাধারণের ব্যবহারের জন্য দান করেন। তিনি কত গ্রন্থকার ও সম্পাদককে তাঁহাদের রচিত বা সম্পাদিত পুস্তকাদি কোন্নগর পুস্তকালয়ে দান করিতে অনুরোধ করিয়া স্বহস্তে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহার সংখ্যা নাই।

শিবচন্দ্র বহুদিন পুস্তকালয়ের সম্পাদকও ছিলেন।

১৮৮৭ সালে বহুদিন শারীরিক অসুস্থতা ও দুর্বলতার জন্য তিনি ঐ পদ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার সম্পাদকতায় পুস্তকালয়ের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। পুস্তকালয়ের জন্য পুস্তক নির্বাচনে তিনি বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করিতেন। তাঁহার চেষ্টায় কোন্নগর পুস্তকালয় শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটি হইতে কয়েক বৎসর অর্থ সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শিবচন্দ্র যখন হিন্দুকলেজে অধ্যয়ন করিতেন, তখন হইতেই তিনি স্ত্রী-শিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। কোন্নগরে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে গৃহনির্মাণ ও মাসিক ব্যয়ের জন্য অর্থসাহায্য চাহিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করেন এবং গৃহনির্মাণ বাবদ স্বয়ং ৫০০ টাকা দান করিতে ও মাসিক ১৫ টাকা সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। গভর্ণমেণ্ট হইতে সাহায্যের আশা না পাইয়া শিবচন্দ্র ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল, নিজ গৃহে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং ছাত্রীদিগের শিক্ষার্থে নিজ ব্যয়েই একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করেন। কিছুদিন পরে গবর্ণমেণ্ট এই বিদ্যালয়ে মাসিক অর্থসাহায্য মঞ্জুর করিয়াছিলেন। তৎপরে শিবচন্দ্র নিজের একখণ্ড ভূমির উপর বালিকা বিদ্যালয়ের উপযোগী একটি বাটী নিজ ব্যয়ে নির্মাণ করিয়া

বিদ্যালয়টি তথায় স্থাপিত করিলেন। শিবচন্দ্রের তত্ত্বাবধানে এই বিদ্যালয়ের এরূপ উন্নতি হইয়াছিল যে প্রতি বৎসর ইহা হইতে কয়েকজন ছাত্রী বাঙ্গালা ছাত্রীবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইত। কোন্নগরের বালিকা বিদ্যালয়টি এখনও বর্তমান।

ভারতীয় নারীদের অকৃত্রিম বন্ধু, মেরী কার্পেণ্টার, ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে যখন কলিকাতায় পদার্পণ করেন, তখন শিবচন্দ্র তাঁহাকে কোন্নগরের বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করিবার জন্য অনুরোধ করেন। মেরী কার্পেণ্টার কোন্নগরের বালিকা বিদ্যালয়, ইংরাজী বিদ্যালয় ও বাঙ্গালা পাঠশালা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বালকবালিকাদিগকে ভূগোল ও অন্যান্য বিষয়ে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, এবং স্বরচিত "ভারতে ছয় মাস" (Six months in India) নামক গ্রন্থে এই পরিদর্শনের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন।

শিবচন্দ্র মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে, ১৮৮৮ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বরে, তিনি একখানি ট্রাষ্ট্‌ডীড্‌ প্রস্তুত করিয়া ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ও সত্যপ্রিয় দেব, এই তিনজন ট্রাষ্টী নিযুক্ত করেন এবং ইংরাজী বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য প্রদত্ত ভূমি সমেত ইমারত ট্রাষ্টীদের হস্তে অর্পণ করেন।

ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে প্রথম স্থাপনের সময়ে কোন্নগর গ্রামে কোনও ষ্টেশন স্থাপিত হয় নাই; এজন্য কোন্নগরনিবাসীদিগকে রেল ধরিতে হইলে তিন মাইল পথ হাঁটিয়া, হয় শ্রীরামপুর নতুবা বালী যাইতে হইত। কোন্নগরে যাহাতে একটি ষ্টেশন স্থাপিত হয় সেজন্য শিবচন্দ্র ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এজেণ্ট ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের নিকট আবেদনাদি করেন এবং তাহারই ফলে কোন্নগরে রেল স্টেশন স্থাপিত হয়।

কোন্নগরে তখন কোন ডাকঘর ছিল না বলিয়া গ্রামবাসীদের বিশেষ অসুবিধা হইত। এই অভাব দূর করিবার উদ্দেশ্যে শিবচন্দ্র আপাততঃ তিন মাসের পরীক্ষায় কোন্নগরে একটি ডাকঘর খুলিতে পোষ্টমাষ্টার জেনারেলকে বিশেষ অনুরোধ করেন, এবং উক্ত পরীক্ষাকালে আয়ের অতিরিক্ত যদি কিছু ব্যয় হয় তাহার জন্য নিজে দায়ী হইতে স্বীকৃত হন। সেই অনুসারে ১৮৫৮ সালে, কোন্নগরে একটি ক্ষুদ্র ডাকঘর অস্থায়ীভাবে স্থাপিত হইয়া পরে স্থায়ী হয়। কোন্নগরের ডাকঘর এখন বিলক্ষণ সমৃদ্ধিশালী এবং ইহার কার্যকলাপ যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

কোন্নগর হিতৈষিণী সভা স্থাপনের সময়ে শিবচন্দ্রের বিশেষ লক্ষ্য ছিল, কিসে গ্রামের রাস্তাঘাট ও জলনির্গমের

পথ প্রভৃতির উন্নতি করিয়া এবং জঙ্গলাদি পরিস্কার করিয়া গ্রামের স্বাস্থ্য ও শোভা বৃদ্ধি করিবেন। কিন্তু গ্রাম-বাসীদিগের উৎসাহের অভাব ও ঔদাসীন্যের জন্য তিনি তখন তেমন কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। পরে যখন তিনি দীর্ঘকাল শ্রীরামপুরের অন্যতম মিউনিসিপ্যাল কমিশনারের পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ঐ উদ্দেশ্য সাধনের সুযোগ পাইয়াছিলেন, তখন সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে তিনি ক্রটি করেন নাই।

১৮৬৫ সালে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে শ্রীরামপুরের একজন মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নিযুক্ত করেন। তখন কোন্নগর শ্রীরামপুর মিউনিসিপ্যালিটির অধীন ছিল।

শিবচন্দ্রের যত্নে এবং প্রধানতঃ তাঁহার অর্থসাহায্যে, একটি নৈশবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া অনেক দিন ছিল। কিন্তু যাহাদের শিক্ষা উক্ত বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল, সেই শ্রমজীবিগণ বিদ্যালয়ের সুবিধা গ্রহণ করিতে আগ্রহী নহে দেখিয়া বিদ্যালয়টি পরিশেষে উঠাইয়া দেওয়া হয়।

শিবচন্দ্রের ও কতিপয় শিক্ষিত যুবকের সমবেত চেষ্টায়, ১৮৮৪ সালের কোন্নগরে একটি রেট্‌পেয়ার্স এসোসিয়েসন (মিউনিসিপ্যাল করদাতাদের সভা) স্থাপিত হয় এবং কিয়ৎকাল স্থগিত থাকিয়া ১৮৮৭ সালে পুনর্জীবিত হয়।

শিবচন্দ্রের ন্যায় আর একজন মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক স্বগ্রামের এরূপ সর্বাঙ্গীণ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে সক্ষম হইয়াছেন, আমরা এমন সংবাদ পাই নাই। তিনি নীরবে কোন্নগরের জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, অনেক রাজা মহারাজাও তাহা করিতে পারিতেন কিনা সন্দেহ। তিনি রাজসম্মানের প্রার্থী হইয়া বা লোকরঞ্জনের জন্য কোনও কাজ করেন নাই। শিবচন্দ্রের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাপত্র সেই বিশ্বতশ্চক্ষু রাজাধিরাজের দরবারে দেদীপ্যমান, যিনি সর্বব্যাপী ও সর্বান্তর্যামী।

বিদ্যানুরাগ

শিবচন্দ্র আজীবন অধ্যয়নশীল ছিলেন। কোন্নগর সাধারণ পুস্তকালয় স্থাপন করিয়া তিনি বহুবৎসর ধরিয়া সংগৃহীত নিজের পুস্তকসমূহ সাধারণের ব্যবহারের জন্য পুস্তকালয়ে দান করেন। কিন্তু তিনি পুস্তকপাঠে কখনও বিরত হন নাই; কোন্নগর পুস্তকালয়ের জন্য নির্বাচিত অধিকাংশ নূতন পুস্তক তিনি অন্ততঃ আংশিক ভাবে পাঠ করিয়া পুস্তকালয়ে পাঠাইতেন। ১৮৬১ খ্রীঃ হইতে ১৮৮৮ খ্রীঃ পর্যন্ত তিনি কলিকাতা সাধারণ পুস্তকালয়ের (যাহা পরে ইম্পিরিয়্যাল লাইব্রেরিভুক্ত হয়) একজন স্বত্বাধিকারী ছিলেন। এই দীর্ঘকাল তিনি সদাসর্বদা ঐ পুস্তকালয়ের পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা

পাঠের জন্য লইয়া আসিতেন। তিনি ভ্রমণকাহিনী, ইতিবৃত্ত, নীতি ও শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তক বিশেষতঃ দর্শন, ধর্মবিজ্ঞান, স্পিরিচুয়্যালিজম্ (অধ্যাত্মবিজ্ঞান) সম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাঠ করিতে ভালবাসিতেন।

তিনি বাঙ্গালা ও ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ইহা বলা বাহুল্য। সংস্কৃত ভাষাতেও তাঁহার যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। রাজকার্যের অনুরোধে শিবচন্দ্র উড়িয়া, হিন্দি, উর্দ্দু, ও পার্শী ভাষারও অনুশীলন করিয়াছিলেন; ছয় বৎসর বালেশ্বর জেলায় কর্ম করিয়া তিনি উড়িয়া ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নব্য সিভিলিয়ানদিগের দেশীয় ভাষায় পরীক্ষার পরীক্ষকসমিতির অন্যতম সভ্য ছিলেন এবং কিছুদিনের জন্য ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটির (দেশীয় সাহিত্যের সমিতি) কমিটির অন্যতম সভ্য ছিলেন। হুগলী জেলার শিক্ষাসমিতির সভ্য হইয়া শিবচন্দ্রকে মধ্যে মধ্যে হুগলী যাইতেও হইত।

ইংরাজি উচ্চশিক্ষার প্রথম যুগে হিন্দুকলেজের একজন প্রতিষ্ঠাবান ছাত্র হইয়াও শিবচন্দ্র মাতৃভাষার চির অনুরাগী ছিলেন। "শিশুপালন" গ্রন্থ রচনা করিয়াই শিবচন্দ্র তৎকালীন বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। রায় দীনবন্ধু মিত্রের মহাশয় তাঁহার সুললিত "সুরধুনী

কাব্যে” এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়া শিবচন্দ্রের পরিচয় দিয়াছেন—

“কায়স্থ নিবাস কোন্নগর বিশাল,
স্থিত যথা শিবচন্দ্র পুণ্যের প্রবাল,
শিশুপালনের পিতা, প্রশান্ত স্বভাব,
সুশিক্ষিতা ছয় মেয়ে ভারতীর ভাব।”

“শিশুপালন” গ্রন্থের দুই ভাগই তৎকালীন সর্বশ্রেষ্ঠ দেশীয় সংবাদপত্র হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় প্রশংসার সহিত সমালোচিত হইয়াছিল। শিবচন্দ্র ১৮৬৭ সালে “অধ্যাত্মবিজ্ঞান” নামে স্পিরিচুয়্যালিজ্‌ম্‌ বিষয়ে একটি পুস্তক রচনা করেন। শিবচন্দ্র সচরাচর ইংরেজীতে চিঠিপত্র লিখিতেন কিন্তু ঐ ভাষায় কোন পুস্তক রচনা করেন নাই।

শিবচন্দ্র বাগ্মী ছিলেন না কিন্তু নিরলস কর্মী, উৎসর্গীকৃতপ্রাণ সমাজসেবক এবং দেশের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। দেশের হিতকর সকল অনুষ্ঠানে তিনি উৎসাহের সহিত যোগ দিতেন। বহু জনহিতকর সভা সমিতির সহিত তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন এবং নানাভাবে সাহায্য করিতেন; তন্মধ্যে নিম্নে কিছু উল্লেখ করা হইল,—

সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার জন্য স্থাপিত বেথুন সোসাইটি, এগ্রি-হর্টিকালচার্যাল সোসাইটি (এখান

হইতে বহুপ্রকার উৎকৃষ্ট এবং দুষ্প্রাপ্য ফলের বৃক্ষ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় উদ্যানে রোপন করেন), প্যারীচরণ সরকার প্রতিষ্ঠিত সুরাপাননিবারনী সভা (স্বগ্রামবাসী বহুজনকে শিবচন্দ্র সুরাপান হইতে নিবৃত্ত করেন ও অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করাইয়াছিলেন); মেরী কার্পেণ্টার প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েসন; কেশবচন্দ্র সেন স্থাপিত ইণ্ডিয়ান রিফর্ম এসোসিয়েশন; সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি স্থাপিত ভারত সভা বা ইণ্ডিযান এসোসিয়েশন, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রতিষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেসন অভ সায়েন্স প্রভৃতি। শিবচন্দ্র উত্তর-পাড়া হিতকরী সভার পরম হিতৈষী ছিলেন এবং ঐ সভা তাঁহাকে অন্যতম সম্মানীয় সভ্য (Honorary Member) নির্বাচিত করেন।

পারিবারিক জীবন

শিবচন্দ্র নিজ বিবাহ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"আমি সর্বদা আপনাকে সৌভাগ্যশালী মনে করি যে এমন স্ত্রীলাভ করিয়াছি যিনি সর্বতোভাবে প্রণয় পাইবার যোগ্যা। তাঁহার স্বাভাবিক সুবিবেচনা, তাঁহার ধর্মশীলতা ও মদ্‌গতচিত্ততা প্রশংসার সীমাতীত"।

শিবচন্দ্রের ছয়টি কন্যা ও একটি পুত্র হইয়াছিল। সন্তানগণের নাম ও জন্মকাল প্রদত্ত হইল :—
প্রথমা কন্যা কৈলাসকামিনী (জন্ম ২রা জুলাই, ১৮৩৫),
দ্বিতীয়া কন্যা মোক্ষদা (জন্ম ১৮ই জানুয়ারী, ১৮৫০),
তৃতীয়া কন্যা বিনোদা (জন্ম ২২শে আগষ্ট, ১৮৪৩),
চতুর্থা কন্যা ক্ষীরোদা (জন্ম ১৯শে মার্চ, ১৮৪৬),
পঞ্চমা কন্যা ক্ষেমদা (জন্ম ১৬ই ডিসেম্বর, ১৮৪৭),
ষষ্ঠা কন্যা রমাসুন্দরী (জন্ম ১৫ই নভেম্বর, ১৮৪৯) ;
এবং শিবচন্দ্রের একমাত্র পুত্র সত্যপ্রিয়ের জন্ম ২২শে জুলাই, ১৮৫৬।

পিতার মৃত্যুর তিন চারিবৎসর পরে শিবচন্দ্র পৈতৃক বাটীর পার্শ্ববর্ত্তী ভূমিতে সুবৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করিয়া ১৮৫৯ সালের ২২শে মে, নূতন গৃহে প্রবেশ করেন।

শিবচন্দ্রের দাম্পত্যজীবন অতিশয় সুখ ও শান্তিপূর্ণ ছিল। পঁয়ষট্টি বৎসরের মধ্যে স্বামী ও স্ত্রীর একদিনের তরেও পরস্পরের মধ্যে কথান্তর বা মনান্তর উপস্থিত হয় নাই, এ কথা শুনিলে সহজে বিশ্বাস হয় না। শিবচন্দ্রের পত্নী তাঁহার স্বামীকে কেবল পতি বলিয়া ভালবাসিতেন তাহা নহে, আজীবন তাঁহাকে শিক্ষাগুরু ও দীক্ষাগুরু বলিয়া ভক্তি করিতেন এবং সকল বিষয়ে তাঁহার উপদেশ অনুসারে চলিতেন।

শিবচন্দ্রের পত্নী অতি ধর্মপরায়ণা ছিলেন, পূজা

আহ্নিকে যত দিন বিশ্বাস ছিল, নিত্য সন্ধ্যা আহ্নিক না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইবার পর তিনি স্বামীর সহিত প্রত্যহ নিয়মিতরূপে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন।

শিবচন্দ্রের অমায়িক স্বভাবগুণে আবালবৃদ্ধবণিতা, সকল শ্রেণীর লোক, তাঁহাকে নিজ নিজ দুঃখ বা অভাব জানাইতে সঙ্কোচ বোধ করিত না ; তিনিও সাধ্যানুসারে তাহা মোচন করিবার চেষ্টা করিতেন।

বিবাদের পরিবর্তে শান্তি, এবং মনোমালিন্যের পরিবর্তে প্রীতি স্থাপন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তিনি মধ্যস্থ হইয়া যে সকল বিবাদ মিটাইয়া দিয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে।

শিবচন্দ্র প্রাচীন বয়সেও যুবকের ন্যায় স্ফূর্তিমান, উৎসাহী, উদ্যমশীল ও উন্নতিশীল ছিলেন ; শিবচন্দ্রের মন অতি উদার ও গ্রহণশীল ছিল। যেখানেই তিনি উন্নত ও মহৎ ভাবের প্রকাশ দেখিয়াছেন, শিবচন্দ্র সর্বদা সেই ভাবটি বুঝিবার চেষ্টা করিতেন এবং যুক্তিসহ, উদার এবং মঙ্গলকর বুঝিলে তাহা সমর্থন ও গ্রহণ করিতে সদা উদ্যত ছিলেন। এজন্য তিনি তরুণবয়স্ক উৎসাহী ব্যক্তিগণের সহিত মিশিতে বড় ভালবাসিতেন।

"অক্রোধেন জয়েৎ ক্রোধম্" এই মহাবাক্য শিবচন্দ্রের জীবনে অক্ষরে অক্ষরে পালিত হইয়াছিল। জীবনে

তাঁহাকে কেহ কখনও ক্রুদ্ধ হইতে দেখে নাই। বাটীতে কোনওরূপ গণ্ডগোল বা বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হইলে তিনি কেবলমাত্র ধীরে ধীরে "এসব অশান্তি, অশান্তি" এই বলিয়া নিরস্ত হইতেন। শিবচন্দ্রের প্রতি কেহ কোনরূপ অপ্রিয় ব্যবহার করিলে তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ ভুলিয়া যাইতেন ; কিন্তু কেহ তাঁহার সামান্য উপকার করিলেও তিনি সেজন্য আজীবন কৃতজ্ঞ থাকিতেন। কৈশোরে যে জ্ঞাতিভগ্নীর আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি কলিকাতায় বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন, তাঁহাকে তিনি আজীবন মাসিক বৃত্তি দিতেন এবং প্রতি বৎসর পূজার সময় তাঁহর পরিবারবর্গের জন্য বস্ত্র প্রেরণ করিতেন।

সকল বিষয়ের ন্যায় অর্থ বিষয়েও শিবচন্দ্রের বিশেষ শৃঙ্খলাবোধ ও অনুকম্পা ছিল। সকল মাসিক দেয় অর্থ মাসের প্রথমেই সকলকে দিতেন। প্রাপক ঠিক সময়ে উপস্থিত না হইলে তিনি তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া তাহার প্রাপ্য দিতেন। শিবচন্দ্র ভৃত্যগণের বেতনও মাসকাবার হইলেই দিতেন, তাহাদের কাহাকেও উহা চাহিতে হইত না। তিনি নিজে স্বহস্তে সরকার, পাচক ব্রাহ্মণ, গোসেবক, দ্বারবান, মালী ইত্যাদিকে বেতন দিয়া আসিতেন। পত্রলেখক যিনিই হউন শিবচন্দ্র সকল পত্রের উত্তর তৎক্ষণাৎ দিতেন।

শিবচন্দ্রের দয়া সর্বজীবে সমভাবে ছিল। ধৈর্য, তিতিক্ষা ও সন্তোষ শিবচন্দ্রের জীবনের নিত্য সহচর ছিল। তিনি অসন্তুষ্ট লোকদিগকে ইংরাজী ভাষায় সর্বদা উপদেশ দিতেন—"Have patience" অর্থাৎ ধৈর্য্যবলম্বন কর। তাঁহার এই উপদেশ কেবল মুখের কথা ছিল না,—তিনি নিজে এই উপদেশের জলন্ত দৃষ্টান্তস্থল ছিলেন।

শিবচন্দ্র নিজে যেমন সময় নষ্ট করিতেন না, তেমনি অপরেরও যাহাতে সময় নষ্ট বা কাজের ক্ষতি না হয়, সাধ্যমত তাহার চেষ্টা করিতেন।

ব্রাহ্মসমাজ

শিবচন্দ্র বাল্যকালে স্বভাবতঃই কুলধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন এবং যথারীতি প্রতিদিন পূজা আহ্নিক করিতেন। ডিরোজিওর সংস্রবে আসিবার ফলে প্রচলিত হিন্দুধর্মে তাঁহার বিশ্বাস লোপ পায় এবং তিনি একেশ্বরবাদী হন। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র ব্রাহ্মধর্মসম্বন্ধীয় মত ও বিশ্বাস বিষয়ক বিবরণ পাঠ করিয়া তিনি "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র গ্রাহক হন এবং উক্ত পত্রিকাতে প্রদত্ত উপাসনাপদ্ধতি অনুসারে একমাত্র অদ্বিতীয় পরমেশ্বরের উপাসনা করিতে আরম্ভ করেন।

ব্রাহ্মধর্মের সহিত শিবচন্দ্রের এই প্রথম পরিচয় নহে। তিনি পঠদ্দশায় ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক রাজা রামমোহন রায়ের সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজে যাইতেন। সেই সময়ের উপাসনার যে বিবরণ তিনি মিস কলেটকে লিখিয়াছিলেন তাহাতে রাজা রামমোহন রায় বিষয়ে লেখেন,—'রামমোহন রায় প্রত্যেক সভায় উপস্থিত থাকিতেন এবং উপাসকগণের মধ্যে নির্বিশেষে বসিতেন। উপাসক-মণ্ডলীর মধ্যে যদি কেহ বক্তৃতার অন্তর্ভুক্ত কোনও বিষয় সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন করিতেন বা কোনও ধর্মমত সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ প্রকাশ করিতেন, তাহা হইলে রাজা সেই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্য, অথবা উপযোগী ব্যাখ্যা দ্বারা সেই সন্দেহভঞ্জন করিবার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকিতেন।'

১৮৪৬ সালে শিবচন্দ্র মেদিনীপুরে একটি ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপন করেন; ১৮৫০ সালে শিবচন্দ্র বদলি হওয়াতে মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের কাজ কিছুদিন স্থগিত থাকে। পরে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর গবর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইলে পর তিনি মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজ পুনরুজ্জীবিত করেন।

১৮৫০ সালে শিবচন্দ্র বিধিপূর্বক ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করেন এবং কলিকাতা আদি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হন। কোন্নগরের আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে তিনি উদাসীন

থাকিবেন ইহা সম্ভবপর নহে। ১৮৬৩ সালের প্রারম্ভে রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াই শিবচন্দ্র এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে উদ্যোগী হইলেন। কোন্নগরে ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপনের জন্য নিজ বাটীতে একটি সুবৃহৎ দালান নির্মাণ করিয়া সেই নবনির্মিত দালানে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, বাং ১২৭০, ইং ২৮শে মে, ১৮৬৩ সালে কোন্নগর ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অনুষ্ঠানে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর উপাসনা করেন এবং উপাসনার পূর্বে শিবচন্দ্র "সামাজিক উপাসনার আবশ্যকতা" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন।

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজে প্রথমে পাক্ষিক উপাসনা হইত। ১৮৭০ সালের আগস্ট হইতে প্রতি রবিবার উপাসনার ব্যবস্থা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে মহাত্মা শিবচন্দ্রের মন অতি উদার ও উন্নতিশীল ছিল, এবং সকল কল্যাণকর নব প্রচেষ্টায় তিনি উৎসাহী ছিলেন। যখন নব্য উন্নতিশীল ব্রাহ্মগণ ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হইতে নানা কারণে বিচ্ছিন্ন হইয়া গণতন্ত্রমতে ধর্মসমাজ পরিচালনার উদ্যোগ করিয়া ব্রাহ্মসমাজ কমিটি গঠন করেন, তখন তাঁহারা শিবচন্দ্রকে ঐ কমিটির সম্পাদক নির্বাচন করেন। কিছু-দিন পরে ১৮৭৮ সালে যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়, তখন আনন্দমোহন বসু, শিবচন্দ্র দেব ও উমেশচন্দ্র

দত্ত নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজের যথাক্রমে সভাপতি, সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। যে সকল ব্রাহ্ম নূতন সমাজ সংগঠন করিয়াছিলেন শিবচন্দ্রই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের অধিনায়ক ছিলেন; কিন্তু তিনি স্বভাবসিদ্ধ বিনয়ের বশবর্তী হইয়া সভাপতির পদ গ্রহণ করেন নাই। সম্পাদকের কার্য শিবচন্দ্র দুই বৎসর করিয়াছিলেন।

১৮৭৯ সালের ২৩শে জানুয়ারী বাং ১১ই মাঘ, ১২৮৪ সালে যখন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা হয়, তখন শিবচন্দ্রই উক্ত সমাজের প্রাচীনতম সভ্য বলিয়া ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন।

শিবচন্দ্র ১৮৮০ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর ঐ পদে বৃত থাকেন। তৎপরে, উপর্যুপরি দুই বৎসর, অর্থাৎ ১৮৮৬ ও ১৮৮৭ সালে, শিবচন্দ্র পুনরায় সভাপতি নির্বাচিত হন। মৃত্যুর তিন বৎসর পূর্বে তিনি শারীরিক দুর্বলতা ও অসুস্থতার জন্য সভাপতিত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

১৮৮০ সালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান হয়। সভাপতি প্রবীন শিবচন্দ্র দেব একটি সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা করিয়া মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করেন।

প্রার্থনাটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"কৃপাসিন্ধু পরমেশ্বর। অদ্য পবিত্র সময়ে তুমি আমাদিগকে আশ্রয় দাও। যে গৃহে জাতি, বর্ণ, অবস্থা নির্বিশেষে সকল নরনারী

তোমার পূজা করিয়া শান্তি ও পবিত্রতা লাভ করিবে, অদ্য আমরা সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইব, যেখানে আমাদের ন্যায় তোমার দুর্বল সন্তান মস্তক রাখিয়া জুড়াইবে, সেই গৃহে অদ্য আমরা স্থান প্রাপ্ত হইব। তুমি আমাদের ধর্মপথের নেতা, আমরা অপর নেতা জানি না। তুমি আমাদের সহায় হইয়া এই গৃহকে সুসম্পন্ন করিয়াছ, অদ্য আমরা তোমার পবিত্র নাম স্মরণপূর্বক এই গৃহে প্রবেশ করিতেছি। তুমি আশীর্বাদ কর, যে সকল আশা করিয়া এই গৃহে প্রবিষ্ট হইতেছি যেন তাহা পূর্ণ হয়। যে ধর্মের দ্বারা আমাদের আত্মার সদ্গতি ও মানবের মুক্তির পথ উন্মুক্ত হইবে, সেই ধর্ম দেশমধ্যে প্রচার করিবার জন্য এই দ্বার উন্মুক্ত করিলে, আমরা ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভরে অবনত হইয়া এই দ্বারে অদ্য প্রবিষ্ট হইব। দীনবন্ধু! দেখিও এই গৃহে যেন তোমার পবিত্র ধর্মের গৌরব দিন দিন বর্দ্ধিত হয়। তোমার শুভ ইচ্ছা এখানে জাগ্রত থাকিয়া যেন আমাদের সকলের মুক্তির উপায় বিধান করে। যাহারা নিরাশ্রয় হইয়া তোমার শরণাপন্ন হয়, যাহারা সরল প্রাণে তোমার অনুগত হইবার ইচ্ছা করে, যাহারা সকল প্রকার স্বার্থ ও অভিসন্ধি বিসর্জন করিয়া তোমার কৃপার উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে, তুমি যে তাহাদের সহায়, এই গৃহই তাহার পরিচয় দিতেছে। জগদীশ! যাহাকে অল্প দেও, সে যে অধিক আশা করিয়া থাকে। আমরা আশা করিতেছি, তোমার কৃপাতে যে কেবল আমরা সুন্দর ঘর পাইলাম তাহা নহে, কিন্তু তোমার কৃপাতে আমরা ধর্মরাজ্যেও অভয়পদ প্রাপ্ত হইব। তুমি আমাদের অন্তর বাহিরের সকল প্রকার বিঘ্ন বাধা পরিহার করিবে। আশীর্বাদ কর যেন এই আশা পরিপূর্ণ হয়।

জগদীশ্বর! অদ্য আমরা তোমার নামে এই গৃহকে উৎসর্গ করিতেছি। তুমি এই শুভ কার্যে আমাদের সহায় হও।) অদ্য হইতে তোমার পবিত্র নাম প্রচারের জন্য এই গৃহের দ্বার উন্মুক্ত হইল;

তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্বাদ কর, যেন এই গৃহ এখানকার উপাসকগণের আধ্যাত্মিক কল্যাণের এবং দেশ মধ্যে তোমার পবিত্র ধর্ম প্রচারের উপায়স্বরূপ হয়। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।"

কোন্নগর ব্রাহ্মসমাজের মন্দির নির্মাণের জন্য শিবচন্দ্র কেবল অর্থদান করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি গঙ্গাতীরে ষোল কাঠা জমিও দান করিয়াছিলেন। ১৮৭৯ সালের ৮ই মার্চে দোলপূর্ণিমা তিথিতে নূতন মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

মন্দির প্রতিষ্ঠার অল্পদিন পূর্বে, শিবচন্দ্র একখানি ট্রাষ্ট-ডীড (অর্পণ-নামা) প্রস্তুত করিয়া নিম্নলিখিত পাঁচজন ব্যক্তিকে ব্রহ্মমন্দিরের ট্রাষ্টী (অছি) নিযুক্ত করিয়াছিলেন:—আনন্দমোহন বসু, উমেশচন্দ্র দত্ত, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সাতকড়ি দেব, ও সত্যপ্রিয় দেব।

ধর্ম বিষয়ে শিবচন্দ্রের কোনওরূপ সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। তিনি পৌত্তলিকতা বা কোনও প্রকার কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দিতেন না, কিন্তু প্রকৃত ঈশ্বরপ্রেমিক, যে কোনও ধর্মাবলম্বীই হউন না কেন, শিবচন্দ্রের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেন।

শিবচন্দ্রের মুখে ধর্মের কথা বড় একটা শুনা যাইত না, কিন্তু তাঁহার হৃদয়কন্দরে ধর্মভাব নিরন্তর জাগরুক থাকিত। ধর্ম তাঁহার প্রাণের প্রাণ হইয়া সমগ্র জীবনে

ব্যাপ্ত ও অন্তর্নিহিত ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত যে ধর্মসাধন নিতান্ত স্বভাবসিদ্ধ ও অনায়াসসাধ্য। শিবচন্দ্র প্রত্যহ স্নানান্তে পরিজনবেষ্টিত হইয়া শান্ত সমাহিতচিত্তে ঈশ্বরোপাসনা করিতেন এবং উপাসনান্তে কোনও ধর্ম গ্রন্থ হইতে পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন। যাঁহারা তাঁহার সেই পারিবারিক উপাসনায় যোগ দিয়াছেন, প্রকৃত উপাসনা কাহাকে বলে তাহা তাঁহাদের জানিতে বাকী নাই। তাঁহার সদ্‌চিন্তা ও মানবপ্রেম সদনুষ্ঠানে প্রকাশ পাইত, ভাবোচ্ছাসে বা অশ্রুধারায় নহে। অতি দুর্বিষহ শোকেও তিনি বিচলিত হইতেন না; তাঁহাকে কখনও অশ্রুপাত করিতে দেখা যায় নাই। ভগবানের মঙ্গলবিধানে অটল বিশ্বাস ছিল বলিয়া শিবচন্দ্র নিদারুণ শোকের সময়েও নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির থাকিয়া এক মুহূর্তের জন্যও কর্তব্য পালনে অবহেলা করেন নাই।

তাঁহার ন্যায় প্রকৃত সংযমী গৃহী অতি অল্পই দেখা গিয়াছে। তিনি সংযম ও মিতাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তিনি সত্যবাদী, স্বল্পবাক্ ও মিষ্টভাষী ছিলেন; কথা কহিবার সময় তাঁহার মৃদুস্মিতোজ্জ্বল সৌম্য মুখমণ্ডল যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনি আর তাহা ভুলিবেন না।

শেষ

মৃত্যুর বহু বৎসর পূর্বে শিবচন্দ্র পরলোক যাত্রার সম্বল সংগ্রহে তৎপর ছিলেন। তাঁহার ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ ধর্মচিন্তা হইতে ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এই জন্যই তিনি তাঁহার দেহত্যাগের কয়েক বৎসর পূর্বে বলিতে সক্ষম হইয়াছিলেন—"আমি প্রস্তুত আছি।"

১৮৯০ সালে শিবচন্দ্র প্রবল জ্বররোগাক্রান্ত হন এবং সেই জ্বর ক্রমে অতিসারে পরিণত হয়। তখন তিনি চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসেন। দীর্ঘকাল রোগ ভোগ করিয়াও শিবচন্দ্র এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার সহিষ্ণুতা ও প্রকৃতি মাধুর্য হারান নাই। শেষদিন পর্যন্ত সকলকে মিষ্ট সম্ভাষণে তুষ্ট করিয়াছিলেন।

১৮৯০ সালের ১২ই নভেম্বরে, সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শিবচন্দ্র দিব্যধামে চলিয়া যান।

শিবচন্দ্রের জীবননদী উৎপত্তি হইতে শেষ পর্যন্ত পবিত্রতা, শান্তি ও নৈতিক সৌন্দর্যের আধার ছিল। ইক্ষুদণ্ডের ন্যায় তাঁহার জীবন-যষ্ঠির প্রত্যেক গ্রন্থিই সরস ও মধুময় ছিল।

ধীর, শান্ত, অনাড়ম্বর, পবিত্রচিত্ত, সংযতজীবন স্বল্পভাষী, মিতাচারী শিবচন্দ্র তাঁহার জীবনে ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, আদর্শানুরাগ

মানবসেবা ও কর্তব্যনিষ্ঠার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়। সেই জীবন যাঁহারা আলোচনা করিবেন সকলেই নবপ্রেরণা ও নব উৎসাহ লাভ করিবেন, তাঁহাদের প্রাণে নূতন শুভসংকল্প জাগিবে। আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী ঠিকই বলিয়াছেন "শিবচন্দ্রের জীবন আদর্শ ব্রাহ্মজীবন।"

—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ লিখিত জীবনচরিত হইতে সঙ্কলিত

"শিবচন্দ্র দেব ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী" বক্তৃতাটি অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী কোন্নগর পাঠাগারে "কালীচরণ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতা"রূপে ১৭৭৫ সালে প্রদান করেন। বক্তৃতাটি "সংহতি" পত্রিকায় ১৭৭৫ সালে পৌষ হইতে চৈত্র চারি সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।

আদর্শ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ মহাত্মা শিবচন্দ্র দেবের জীবনের পুণ্যকথা সকলের নিকটে স্বল্পপরিসরে অনায়াসলভ্য করিবার উদ্দেশ্যে বর্তমান পুস্তকটি প্রকাশিত হইল।

অধ্যাপক ত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী, "কালীচরণ মুখোপাধ্যায় স্মৃতি বক্তৃতামালা"র স্থাপয়িতা শ্রীঅধীর মুখোপাধ্যায় এবং কোন্নগর সাধারণ পাঠাগারের সম্পাদক শ্রীঅনিলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রবন্ধটি মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়া আমাদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

শিবচন্দ্র দেব সম্বন্ধে আরও তথ্য সংযোজনা করিয়া বর্তমান গ্রন্থটিকে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিতে পরিগণিত করিবার জন্য প্রথম প্রবন্ধের পরিপূরকরূপে পরিশিষ্টে নিম্নলিখিত তিনটি সংকলন দেওয়া হইল।

১। শিবচন্দ্র দেব—শিবনাথ শাস্ত্রী লিখিত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" হইতে সংকলন।

২। মহাত্মা শিবচন্দ্র দেব—নীরোদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় লিখিত প্রবন্ধ, কোন্নগর সাধারণ পাঠাগারের শিশু শাখার ১৭৭৫ সালের গল্প বলা প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানের স্মারক গ্রন্থ হইতে।

৩। শিবচন্দ্র দেব—অবিনাশচন্দ্র ঘোষ লিখিত অধুনা দুষ্প্রাপ্য "নরদেব শিবচন্দ্র দেব ও তৎসহধর্মিনীর আদর্শ জীবনালেখ্য" হইতে সংকলন।